গোপনীয়তার মালিকানা

হামীম কামরুল হক

১.

ছোটবেলার একটা ঘটনা খুব মনে পড়ে। একদঙ্গল ছেলের সঙ্গে একা মারামারি করেছিলাম। জিতেও ছিলাম। ওরা ছিল খালি হাত। নিরস্ত্র। আর আমার কাছে ছিল ইয়াবারা। আর কয়েকটা কায়দা শিখেছিলাম কীভাবে কোন জায়গায় ঘা দিলে একটা দুটো ঘুসিই যথেষ্ট। রাজশাহীর সাহেববাজারের ছাত্রবন্ধাব নামের একটা দোকান থেকে জুডোকারাতে শেখার একটা বই কিনেছিলাম। সেখানে কীভাবে হাত শক্ত করতে হয়, শরীরকে তৈরি করতে হয়, আর লড়াইয়ের সময় জায়গা মতো ঘা দিতে হয়– এসব শেখানো ছিল। গরমপানিতে লবণ মিশিয়ে হাত ডোবানো, আগুনে হাত সেঁকা, কাঠের ওপর দিনের পর দিন ঘুষি মারা– এই তিনটা কাজ বেশ কিছুদিন চালিয়ে গেছি। কেউ কখনো টের পায়নি যে আমি নিজে নিজে জুডো-কারাতে শিখছি। আর ছিল ওই সাড়ে ছয় ইঞ্চির ইয়াবারা। খুব শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি এই কাঠিটার দুপ্রান্ত মুড়ানো মানে গোলভাবে তৈরি করা। মাঝখানে খাঁজকাটা। ছাত্রবন্ধু থেকে টিফিনের টাকা জমিয়ে একটা, অন্যটা আম্মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে জুডো কারাতের ওপর দুটো বই কিনেছিলাম। আর কিনেছিলাম ব্রুস লীর অনেকগুলি ভিউকার্ড। একটা জিনিস তখন খুব ভাবতাম। ব্রুস লীর মতো লড়াকু হব। কাউকে ভয় করব না। আর আমার সঙ্গে লড়তে এলে কেউ পারবে না। পরে এই সব ধারণা ভেঙ্গে গেছে। ছেলেবেলার বীরেরা কতবার বদলে গেছে। নিজেকে কেন যে বীর ভাবতাম, কেন বীরের মতো হতে চাইতাম জানি না। কিন্তু ভাবতাম– এটাই জানি।

তখন একবছর হল মাদারিপুর থেকে রাজশাহীতে এসেছি। নতুন স্কুলে আমার তেমন কোনো বন্ধু ছিল না। দুয়েকজন আমার সঙ্গে মিশতে চাইত। কিন্তু আমি কারো সঙ্গে তেমন কোনো কথা বলতাম না। এর অবশ্য কারণ আছে। অল্প দিনের ভেতর বুঝে গিয়েছিলাম আমি সবার চেয়ে আলাদা। এই বোঝাটা যে কারো জন্য অনেক বড় বোঝা হয়ে ওঠে। সেই বোঝার ভার আমাকে এখন পর্যন্ত বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

আমাকে নিয়ে ফিসফিস করে আমার সহপাঠীরা কথা বলত। একেবারে ছোটবেলা থেকে আমার এটা নজরে এসেছে। খুব হট্টগোলের ভেতরে থাকতাম না বলে একা একা অনেক কিছু খেয়াল করতাম। ওরা কী নিয়ে কাকে নিয়ে কখন কী কথাবার্তা বলছে আমার জানতে বা বুঝে নিতে খুব একটা কষ্ট হত না। ওরা বলত আমার বাপের ঠিক নেই। কারো বাপ কেন, কেউ থাকা বা না-থাকায় কি আর কম বেশি হয়। আমি এখন আর এসব কথার কোনো মানে তখন বুঝতে পারি না। একা থাকার কষ্ট আর মজা দুটোই আমি খুব ভালো করে বুঝে নিয়েছিলাম। সেই ছোটবেলা থেকে একা একা চলতে শিখেছিলাম। আমি নিজেই ছিলাম আমার সঙ্গী। আশ্চর্য হয়ে যাই কীভাবে কীভাবে ছোটবেলায় এমন একটা মারাত্মক শিক্ষা আমাকে পেতে হয়েছিল।

দুপুরে কখনো ঘুমাতাম না। নির্জন দুপুরে বইয়ের পাতায় আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেত সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে। মনের এই উড়ালের কথা কেউ কি টের পেত? কে জানে! সবার চোখের আড়ালে জুডো কারাতে জন্য নিজের হাত পা শক্ত করার ব্যাপারটাও কেউ টের পায়নি। একা একা নিজের জন্য একটা লড়াইয়ের জগত গড়ে তুলেছি। তখন ঘটনাটা ঘটে।

কেবল সেভেনে উঠেছি। আমাদের স্কুলেই পড়ত নীতিন। ও বড় বোন নিশিপর্ণা পড়ত মেয়েদের স্কুলে। নিশিপর্ণা দেখতে মাত্রাতিরিক্ত সুন্দর ছিল। অন্তত সে সময় পর্যন্ত ওর চেয়ে কোনো সুন্দর মেয়ে আমার চোখে পড়েনি। এমনকি আজ অবধি সুন্দর কোনো মেয়ে বলতে আমার কাছে নিশিপর্ণার চেহারাটাই সবার আগে ভেসে ওঠে। পরে শুনেছিলাম, কেউ কেউ ওর নাম দিয়েছিল মৎস্যকন্যা, কেউ নাম দিয়েছিল কোকাকোলার বোতল। কথাগুলি বলার সময় দুহাতে অঞ্জলি বাতাসের ঢেউ খেলিয়ে ওপরে নিচে পরপর

দুটোতিনটা বৃত্ত আঁকত। পাশাপাশি ঢেউ খেলে নামত দুই হাতের অঞ্জলি। আমি নিজেও দেখেছি। কেউ বলেছে, 'ওই যে আসছে' বলে– ওইভাবে ঢেউয়ের মুদ্রা দেখাত। আমারও কি নিশিপর্ণাকে দেখলে কেমন কেমন লাগত? ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বোকা হয়ে যেতাম? অল্প বয়সেই আমার সামনে শরীরের অনেক রহস্য ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছিল। তারপরও মনে হয় নিশিপর্ণার চেয়ে আবেদনময়ী আর রহস্যময়ী কোনো মেয়েকে আমি আর কোনোদিন দেখিনি।

আমাদের বাসার কয়েকটা বাসা পরে নীতিন-নিশিপর্ণারা থাকত। ওরা দুইভাই বোন একসঙ্গে আমাদের বাসার সামনে দিয়েই স্কুলে যেত। মারামারি করার পরে থেকে ঢাকা মেডিকেলে দেখা হওয়া আগে পর্যন্ত ওর সঙ্গে কথা বলার তেমন কোনো সুযোগ হয়নি।

নিশিপর্ণাদের জ্যেঠা-কাকারা অনেক আগেই ইন্ডিয়ায় চলে গেছে। ওর বাবার কথা, 'নিজের দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না।' এর প্রথম ফল হল, নিশিপর্ণার বড় বোন এক মুসলিম ডাক্তার ছেলেকে বিয়ে করে প্রথমে চট্টগ্রামে, পরে লন্ডনে চলে যায়।

ওদের মা এটা মেনে নিতে পারেনি। বাবাও নিয়েছিলেন কিনা বোঝা যেত না। নিশিপর্ণাকে বলত, 'দেখ তুই কোনো একটা ছেলেটেলে জোগাড় করতে পারিস নাকি। যেকোনো ধর্মের হলেই চলবে। কেবল মানুষ ভালো হলেই হল।'

নিশিপর্ণা বলত, 'বাবার এই সব কথা মজা করে বলত নাকি ঠাট্টা করার জন্য বলত; বুঝতাম না।'

'তোমার কী মনে হয়?'

'কী আর মনে হবে। বাবার কথা একদিকে তো ঠিকই।'

'কী রকম?'

'ওই যে যে কোনো ধর্মের হলেই চলবে কিন্তু ভালো মানুষ হলেই হল।'

'তোমাকে যদি কোনো মুসলিম ছেলে বিয়ে করতে চায় রাজি হবে?'

'না।'

'তাহলে তো আর হল না।'

'কেমন না মশাই, অনেক ব্যাপার আছে। অনেক সমস্যা আছে।'

নিশিপর্ণা শান্ত আর গাঢ়ভাবে কথাটা বলেছিল। ঢাকা মেডিকেলে পড়ার সময় ও প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। কখনো পাগলামি করত না। ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করত, 'সময় আছে?'

'কেন?'

'আমার সঙ্গে একটু বের হতে পারবে?'

'কেন পারব না!'

নিয়ে যেত নিউমার্কেটে। কখনো কখনো নিজের কোনো সহপাঠীর বাসায়। আর কলাবাগানে সুব্রত নামের এক ভদ্রলোকের কাছে যেত। তিনি মাল্টিন্যাশনাল একটা কোম্পানিতে বড় চাকরি করতেন। আমাকে বসার ঘরে চা নাস্তা দিয়ে দুজনে ভেতরে চলে যেত। এভাবে বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে সুব্রত বাসায় গিয়েছিলাম। বাসা তো না ফ্ল্যাট। তিনি একাই থাকতেন। একদিন হঠাৎ করে এক ভর দুপুরে আমাকে সুব্রতর বাসায় নিয়ে যায়। অনেকক্ষণ ডোরবেল বাজানোর পর দরজা খুলে সুব্রত। ঘেমো মুখ। সুব্রতকে একেবারে ঠেলে সে ঢুকে পড়ে। সুব্রতও ওর পেছন পেছন ছোটে। তারপর ভেতরে ওদের তর্কাতর্কির। এসময় আরেকটা মেয়ে জালিজালি কাপড় পরা একটা মেয়ে আমার সামনে দিয়ে বের হয়ে যায়। এঘটনার পর আর কখনো ওখানে ও যায়নি। আমার সঙ্গেও দেখা হচ্ছিল না অনেকদিন। ওর হলে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি একেবারে ঝলমল করছে। আরো সুন্দর লাগছে। আমি যাওয়াতে কী যে খুশি হয়েছে। এর আগে আমি কখনো ওর হলে যাইনি। আমাকে নিয়ে বের হলে একটা টাকাও আমাকে খরচ করতে

দিত না। এমনতি বেশ চুপচাপ মেয়ে। কিন্তু আমার সঙ্গে কত কথা যে বলত। মাঝে মাঝেই বলত,'এই আমিই শুধু বকবক করছি, তুমি কিছু বলছ না?'
'কী বলব?'
'আচ্ছা তোমার কিছু মনে হয় না?'
'কী মনে হবে?'
'যেমন আমি তোমার প্রেমে পড়েছি কিনা?'
'হ্যা, মনে হয়।'
'কিন্তু তুমি যে কিছু বল না?'
'কারণ লাভ নেই জানি।'
'লোকসানও যে নেই তা জানো না?'
'হ্যা, জানি। এই যে আছি বন্ধুর মতো, তোমার মতো এমন সুন্দর মেয়ের সঙ্গে কথা বলছি, ঘুরছি, এটাও কি কম।'
'ঠিক তা-ই।' বলে নিশিপর্ণা অনেকক্ষণ হেসে ছিল। হাসতে হাসতে হঠাৎ বলেছিল,'জানো আমি তারপরও সুব্রত ছাড়া আর কাউকে ভাবতে পারি না।'
'ওর সঙ্গে তোমার যোগাযোগ নেই।'
'না।'
তারপর আমিই সুব্রত কাছে গিয়েছিলাম। সুব্রতর সঙ্গে নিশিপর্ণার দেখা করিয়ে দিয়েছিলাম। সুব্রতকে বলেছিলাম, 'শুক্রবারে বিকাল পাঁচটায় আমি নিশিকে নিয়ে নিউমার্কেটে বিদ্যাসাগর দোকানে থাকব।' কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। উলটা আমার ওপর এত ক্ষেপে ছিল নিশি। আমার সঙ্গে অনেকদিন আর স্বাভাবিক হতে পারেনি।

২.
আমি এমনিতে ইয়াবারা নিয়ে বের হতাম না। সেসময় ইয়াবারা নাড়াচড়া করতে করতে ছায়াযুদ্ধ করতে শিখেছিলাম। এক হাতে ডানের কাউকে ঘুসি মারি তো অন্য পাশে লাথি। কেবল একপাশে ভর দিয়ে তিন দিকে তিনটি অদৃশ্য শত্রুকে মারছিলাম। এছাড়াও লাফিয়ে উঠে চারদিকে চারজনকে একসঙ্গে মারার কায়দাও আয়ত্ত করেছিলাম। সন্ধ্যা নেমে আসলে আমাদের বাসার পেছনে একটা খাল পেরিয়ে যে মাঠটা পড়ত সেখানে চলে যেতাম।
ওই মারামারি আগে পর্যন্ত আমার নিজের কেমন একটা ছায়ার জগত ছিল। ছায়াযুদ্ধের জগত। আমি আর আমার ছায়ারা। তবে ওই ছায়ারা আমার শত্রু ছিল না। তারা মাঝে মাঝে স্বপ্নের ভেতরে আমার সঙ্গে কথা বলত। আমাকে সর্তক করত। তাদের সঙ্গে আমি আমার রাগ দুঃখ গোপন কথা সব বলতাম। তারা আমাকে লড়াইয়ের মন্ত্র দিত। তারা বলত, তাদের সঙ্গে লড়ে লড়ে শিখে নিতে যে লড়াইটা আসল সময়ে কাজে দিবে। কাজে দিবে হয়তো সারা জীবনে এক কি দুইবার। বেশি হলে তিন কি পাঁচবার, কিন্তু এই পাঁচবার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ছায়ারা আমাকে তাদের সঙ্গে প্রতিদিন লড়াইটা চালিয়ে যেতে বলত। বলত, জীবনের জন্য কোনো কিছুই তেমন জরুরি নয়, একমাত্র দরকারি জিনিস হল, প্রতি মুহূর্তে লড়াইয়ের জন্য নিজেকে তৈরি রাখা। এখত তো মনে হয় ওই ছায়াযুদ্ধের কোনো শেষ নেই।
আমি কেন জানি অনেক কিছু একটু আগে আগে টের পেতাম। টের পেতাম, আমার মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। টের পেতাম, আমি জীবনে অনেক উন্নতি করব, কিন্তু সেই উন্নতি কারো কোনো কাজে লাগবে না, শুধুমাত্র আমার নিজের ছাড়া। টের পেতাম জীবনে প্রচুর ভোগ করার সুযোগ পাব কিন্তু সে সময় ভোগ করব না, আবার যে সময় একদম সুযোগ পাবো না, সে সময় প্রচুর ভোগ

করতে চাইব। যদিও সে সময় এসবের কোনো ভিত্তি ছিল না। তবু মনের ভেতরে এই কথাগুলি আসা যাওয়া করত।
আমি দেখতাম আমার সামনে বাতাসের ভেতরে একটা পর্দা তৈরি হচ্ছে। সেখানে আমি আরব্যরজনীর গল্পের চলচ্চিত্র দেখতে পেতাম। উড়ন্ত চাদরে শাহাজাদীকে নিয়ে আকাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে শাহজাদা। আলাউদ্দীনের সঙ্গে কথা হচ্ছে ইচ্ছাপূরণের দৈত্যের।
মাকে বলতাম, 'আম্মু এমন কিছু আছে?'
'কী বাবা?'
'ওই যে একটা চেরাগ থাকবে তাতে ঘষা দিলে দৈত্য আসবে, আর সেই দৈত্যকে যা এনে দিতে বলব সব এনে দিবে?'
'ঠিক দৈত্যটৈত্য তো আর নাই; কিন্তু এটা হল, তোকে কীভাবে বলি, এটা হচ্ছে যে মানুষকে বোঝানো যে তার ভেতরে একটা ইচ্ছার চেরাগ আছে– তাতে আগুন জ্বালতে পারলে যে যা চায় তা-ই হতে পারে। সে তখন আর মানুষ থাকে না; একটা দৈত্য হয়ে যায়। তখন সে যেকোনো কিছু করার জন্য দৈত্যের মতো খাটতে পারে। কিন্তু অনেকে ওই ইচ্ছার প্রদীপে আগুন জ্বেলে আরেক রকম দৈত্য হয়, ওকে বলে রাক্ষস। দৈত্যটৈত্য তো আসলে এলিগরি।'
'মানে?'
'এসব তুমি বড় হলে বুঝবে বাবা।'
আমি মায়ের কথা তখন না বুঝলেও, অনেক কিছু, মানে যেসব কথা এর ওর কাছ থেকে শুনতাম– মনে করতাম ওরা যা বলছে সবই আছে। এত বিশ্বাস করতাম সবকিছু।

৩.
ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় আমাদের ক্লাসের রাশুর সঙ্গে আমার কীভাবে কীভাবে যেন ভীষণ ভাব হয়ে যায়। ও ওদের বাসায় নিয়ে যেত। ওর বোন তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়ে। ওর বোনের কাছে গল্প শুনেছি এক ধরনের মানুষ আছে যাদের হাতের তালুতে নেওয়া যায়। এক কি দুই ইঞ্চি লম্বা। দেখতে পুরোপুরি মানুষের মতো কিন্তু ওইটুকু দেখতে। তাদের বলে লিলিপুট। আমি এত বিশ্বাস করেছিলাম বাসায় এসে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আম্মু লিলিপুট দেখেছ?'
'কী হয়েছে রে তো একদিন বললি দৈত্যটৈত্য আছে কিনা আজকে বলছিস লিলিপুট, কোথায় পাস এসব?'
'আহা বল না?'
'কী বলব?'
'এসব সত্যি কিনা?'
'না, সত্যি না, তবে মানুষ যেমন দৈত্য হতে পারে তেমনি লিলিপুটও হতে পারে।'
'কীভাবে– যাদু দিয়ে?'
'ঠিক জাদু দিয়ে না; ইচ্ছা করলে বা ঠিক করলে, যে আসলে কী হবে দৈত্য না লিলিপুট।'
'কোনটা হওয়া ভালো?'
'দুটোই।'
'মানে?'
'মানে এখন বুঝতে হবে না।'
রাশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ও কখনো লিলিপুট দেখেছে কি না?'
ওর বোন ওকে বলেছে, 'লিলিপুট দেখতে হলে সাতসমুদ্র তোরো নদী পার হতে হবে।'

‘মানে বিদেশে?’
‘হ্যা।’
আমি অবাক হয়ে ভাবতাম বিদেশেই সব আছে। আমাদের দেশে কিছুই নেই।
আম্মুকে এসবও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করত, ‘আমি কোনটা হব– লিলিপুট না দৈত্য?’
রাশুকে বলতাম, ‘কোনটা হলে ভালোরে?’
রাশু বলে, ‘লিলিপুট হলে কত মজা। যেখানে ইচ্ছা সেখানে লুকিয়ে থাকা যাবে। পিপড়ের মতো।’
আমি বলি, ‘কচু লুকানো যাবে। পায়ের তলায় চাপা খেয়ে মরতে হবে।’
‘চাপা খেয়ে মরব কেন, আমার কি বুদ্ধি নাই। যার বুদ্ধি আছে সে চাপা খেয়ে মরে না।’
আমি বলি, ‘তাহলে হ তুই লিলিপুট।’
‘আহা তা কীভাবে হব।’
‘চাইলেই বলে হওয়া যায়?’
‘কে বলেছে?’
‘আমার আম্মা বলেছে।’
‘কী বলেছে?’
‘এটা যার যার ইচ্ছার ব্যাপার।’
‘তুই কী দৈত্য হবি।’
‘আমি কোনোটাই হব না।’
‘তাহলে কী হবি?’
‘আমি কিছু হব না। আমি যা আছি তাই থাকব।’
‘সে তুই চাইলেও পারবি না।’
‘কেন পারব না?’
‘কেউ কী চিরকাল ছোট থাকে?’
‘তুই কি জন্মের সময়ই এটুক ছিলি? বড় হসনি? সবাই এভাবে একটু একটু করে বড় হয়।’
‘তা তো হব কিন্তু দৈত্যটৈত্য বা লিলিপুট কোনোটাই আমি হব না।’
‘তাহলে?’
‘তাহলে আর কি– আমি মানুষ হব।’
রাশু বলে, ‘মানুষ আবার হতে হয় না কি। মানুষ তো হয়েই থাকে।’
‘তা জানি না, তবে আমি দৈত্য লিলিপুট হতে পারব না।’
তখন একটা অনেকক্ষণ ধরে ভুলে থাকা কিছু মনে পড়ার মতো চিৎকার করে রাশু বলে, ‘আরে দৈত্য না, তাকে বলে গালিভার। তুই সারাক্ষণ কী দৈত্য দৈত্য করছিস।’
‘আমি আলাউদ্দীনের চেরাগের দৈত্যর কথা বলছি।’
‘আর আমিতো বলছি গালিভার আর লিলিপুটের কথা।’
রাশুর সঙ্গে কত কথা যে হয়েছে এইসব নিয়ে। তারপর রাশুরা চট্টগ্রাম চলে গেল।

৪.

আমি ভেবেছিলাম জগতে আমার একটাই বন্ধু হবে। আর সেই বন্ধু রাশু। কিন্তু রাশু চলে যাওয়ার পর আমি আর তেমন কারো সঙ্গে মিশতাম না।

একা একা ঘুরে বড়োতাম সাহেব বাজার থেকে কাজলা গেট পর্যন্ত। এত ছড়ানো রাজশাহী শহরটা। যদিও শহর বলতে একটু খানি জায়গা ওই সাহেববাজার আর এর আশপাশ। কখনো কখনো চলে যেতাম পদ্মার পারে। একা একা বসে থাকতাম। আমার সামনে নদী। নদীর সমানে আমি। আশে পাশের সব লোক চলে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসে আমি বসেই থাকি। আমার কেমন একটা ঘোর ঘোর লাগত। একদিন সে রকমই বসে ছিলাম। আকাশে আবছা চাঁদ। ঘষা ঘষা চাঁদ। একেই কি হিন্দতে বলে, ক্ষয়া ক্ষয়া চাঁদ? নদীর পাড়ে সেই আবছা অন্ধকারে দেখালাম অনেকগুলো লোক আমার দিকে আসছে। পরে দেখি চারজন।

ওদের একজন বেশ কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'আমি আমার নাম বলি।'

'এখানে কী কর?'

'বসে আছি।'

'মাথা ঠিক আছে?'

বলে খ্যাক খ্যাক করে হেসে ওঠে।

আমি বসে থাকব না উঠে চলে যাব বুঝতে পারি না। সেই লোক চারটা আমার চারপাশে এসে দাঁড়ায়। একজন উত্তর দিকে, একজন দক্ষিণ দিকে আরেক জন পুব দিবে আরেক জন পশ্চিম দিকে।

'এই ছেলে তোমার ভয় লাগছে না?'

আমি ধীর ও শান্ত গলায় বলি, 'না।'

'তাহলে যেখানে বসে আছ সেখানে বসে থাক। কোনো কথা বলবে না। এই বোতলটা বের কর।'

আমার ডানে থাকা লোকটা বোতল বের করে।

আরেক জন বলে, 'কমলারে খবর দে।' বলামাত্র দেখি বাম পাশের লোকটা পিঠের দিকে থেকে একটা মেয়েমানুষ বের হয়ে আসে। মেয়েটার গায়ে ব্রা ছাড়া আর কিছু পরা নেই বলেই মনে হল। কোমর থেকে উরুর মাঝমাঝি পর্যন্ত একটা ঘাঘরা।

ক্ষয়া ক্ষয়া চাঁদের আলোয় চরাচরে কোনো শব্দ নেই। চাঁদের আলোটাই যেন সবকিছুকে বিবশ করে রেখেছে। আমি পরেও খেয়াল করেছি পূর্ণিমাটুর্নিমা না ওমন ঘষা ঘষা চাঁদের কেমন একটা মায়া আমাকে আরো অনেকবার বিহ্বল করে দিয়েছে।

কমলা ওদের পেছনে দিয়ে নেচে নেচে ঘুরতে থাকল। আমি কমলার মুখটা খেয়াল করতে চেষ্টা করি। একবার অন্ধকারে একবার চাঁদের আলোও সেই মুখ ভেসে ওঠে তো আবার হারিয়ে যায়। অদ্ভুত একটা মায়া তৈরি হয়ে ফের হারিয়ে যায়। মেয়েটা যেন পৃথিবীর কেউ নয়। তার মুখে কোনো হাসি নেই। লোকগুলি কোনো কথা বলে না। তারা কেবল বোতলটা মুখের কাছ উচিয়ে ধরে একটু খানি গলায় ঢেলে আরেক জনের কাছে সেটা দিয়ে দেয়। এভাবে বোতলাটা তাদের হাতে হাতে ঘোরে। কমলা নেচে যায়। কেউ কোনো কথা বলে না। কেউ কমলার দিকে তাকায়ও না। কমলাও তাদের দিকে তাকায় না। সে কীসের জন্য নেচে যাচ্ছে সে তা নিয়ে তার বা অন্যকারো কোনো বিকার নেই। আমি কেবল সবাইকে দেখতে থাকি। আমি ডান দেখি বাম দেখি পুব দেখি পশ্চিম দেখি । আর দেখি কমলার দেহ দুলে দুলে আমাদের সবাইকে ঘিরে নাচছে। এর ভেতরে একজন বলে, 'কাপড় খোল্ কমলা।'

কমলা কোনো কথা না বলে নাচতে নাচতে তার ব্রাটা খুলে ফেলে। খুলে মাথার ওপরে ঘোরাতে থাকে। ঘোরাতে হঠাৎ ছেড়ে দেয়। ব্রাটা উড়ে গিয়ে পড়ে।

হঠাৎ করে মনে হয় কমলার শরীরটা ওপর দিকে বিরাট হয়ে গেছে। সেখানে প্রবল বেগে পৃথিবীর গহীনতম অন্ধকার ডানে বাঁয়ে দুলছে।। তারপর কমলা কোমরের একটা পাশে বেরিয়ে থাকা ফিতার প্রান্ত ধরে টান দেয়। কোমর থেকে খসে পড়ে সেই ঘাঘরা। সঙ্গে সঙ্গে কমলার শরীরটা যেন আরো বড় হয়ে

যায়। সে যেটুকু ছিল কাপড় পরা অবস্থায় তার চেয়ে অনেক বড় আর কালো অন্ধকার হয়ে সে আমাদের চারপাশে নেচে চলে। তার নাচের গতি বাড়তে থাকে। আমি দেখি সে যেন বাতাসের বেগে নিমিষে আসছে যাচ্ছে। কেবল মনে হচ্ছিল যে একটা কালো ঘুর্ণি আবছা চাঁদের আলোয় আমাদের চারপাশে ঘুরছে। আর হঠাৎ করে একটা তীক্ষ্ম তীব্র হাসি শুনতে পাই।
আমার নাম ধরে কেউ ডাকে আমাকে অনেক দূর থেকে। আমি আমার জায়গায় উঠে দাঁড়াই। লোকগুলি একজন আমাকে বলে, 'এই দাঁড়াইছিস ক্যানে?'
আমি বললাম, 'তাহলে কি তোমাদের মতো বসে থাকব?'
'হ্যা বসে থাকবি।'
'কক্ষনো না।'
আমাকে ঘিরে বসে আছে ওরা। আমি খেয়াল করলাম ওরা একেবারে একজন আনেরকজনের হাঁটুতে হাটু লাগিয়ে আসন করে বসে আমাকে ঘিরে ফেলেছে। আমি এই কথা বলবার পরই তারা বসা অবস্থায়ই চারজন একজন আরেক জনের কাঁধে হাত দিয়ে একটা বেড়া তৈরি করে দিল আমার চারপাশে। আমি লাফিয়ে তাদের পার হয়ে আসি। তারপর আর দৌড়াতে থাকি।
দৌড়াতে দৌড়াতে মনে হয় একটা কালো ছায়া চাঁদের আলো ঢেকে দিয়ে আমাকে ধরতে পিছে পিছে আসছে। তখন পিছন ফিরে দেখি সেই নারীর শরীর বিশাল একটা দৈতের মতো দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। একেবারে পাথর সাদা সেই শরীর। নগ্ন। তার নধর শরীর দৌড়ানোর তালে তালে বিপুলভাবে দুলছে। আমি বাঁচাও বলে চিৎকার করব কিনা ঠিক তখন দেখি আমার সামনে গোটা শরীরটা উবে গেল। কোথায় মিলিয়ে গেল আমি বুঝতে পারলাম না। আমি জাদুমন্ত্রের মতো স্থির দাঁড়িয়ে পড়ি। মনে হল আমার পা মাটিতে গেঁথে গেছে। আর দেখতে থাকি নদীর ওপর দিয়ে ধবধবে সাদা একটা বিশাল পাখির মতো কী একটা চাঁদের ছায়া ঢেকে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

৫.

সেদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে এসে অনেকক্ষণ চুপচাপ নিজের পড়ার টেবিলে বসে থাকি। মনে হচ্ছিল আমি আসলে অন্য কোনোখানে চলে এসছি। যেখানে আমার থাকার কথা ছিল, সেখানে না গিয়ে আমি চলে এসেছি এমন একটা জায়গায় যেখানে আমি একেবারেই বেমানান। নিজের ভেতরে নিজেকে নিয়ে তখন কেমন একটা খেলা খেলতে ইচ্ছা হয়।
তারপরের দিন বিকালে গিয়ে কারাতের বই দুটো কিনে আনি। মনে হয় আমার শরীরটা সত্যিই হতে পারে একটা শক্তির আগার। আমি নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চাই যেন কখনো কেউ আমরা কোনো ক্ষতি করতে না পারে। এসব চিন্তা কীভাবে কীভাবে আমার ভেতরে তৈরি হয়েছিল আমি জানি না।
ইয়াবারা তৈরি করলাম মায়ের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে। মাকে কাঠিটা দেখালামও। মা টাকার দেওয়ার সময় জানতে চেয়েছিলেন, কী করব টাকা দিয়ে।
আমি বলেছিললাম,'আগে দেও, কাজটা হলে পরে জানাব।'
'সত্যি তো?'
আমি বলি, 'সত্যিই।'
মার কাছে তেমন কিছু কোনোদিনও চাইতাম না। আসলে চাওয়া জিনিসটাই আমার ভেতরে ছিল না। না চাইতেই সব এসে যেত। অন্তত বাঁচার জন্য যা যা দরকার। পরে মনে হত বাঁচার জন্য নূন্যতম জিনিসগুলো জোগাড়ের জন্য তেমন কোনো কষ্ট করতে হয় না। ওই উপকরণগুলোর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পর থেকেই আরেক ধরনের সমস্যার শুরু হয়।

আমি ছোটবেলা থেকেই দেখতাম কোনখানটায় গিয়ে আমার আর কারো সঙ্গে মেলে না। নিজের মতো ঘুরি ফিরি। এ ব্যাপারটাও তেমন কারো চোখে পড়ত না। একদিন এমন করে ঘুরতে ফিরতে গিয়ে দেখে নিশিপর্ণাকে পথের ভেতর কয়েকটা ছেলে ঘিরে ফেলেছে। আমাকে দেখেই নিশিপর্ণা চিনতে পারে। ও আমার নাম ধরে ডাকে। আমি এগিয়ে যাই। আমি কাছে যেতেই ছেলেগুলি আমার দিকে ফেরে। ওরা বলেছিল, 'ওর এত দেমাগ কেন তা-ই একটু জানতে এসছিলাম। হাই হ্যালো করি, কোনো পাত্তাই দেয় না।' এমননি এককথা দুকথা তর্কাতর্কির পর শুরু হয় মারামারি। আমি ইয়াবারা বের করি। এমনভাবে বের করি যেন ওরা দেখতে না পারে। ওরা আমার একেকটা মারে বুঝতে পারছিল না যে কোনখান থেকে কী দিয়ে আমি ওদের মারছি। আমি জেনে গিয়েছিলাম ঠিক কোন কোন জায়গায় মারতে হবে। নাক বরাবর, কণ্ঠনালী, ঘাড়ে, বুকে পাঁজরের হাঁড়গুলোর মাঝামাঝি ও পাশে, তলপেটে, উরুসন্ধিতে, হাঁটুর একটু ওপরে আর একটু নিচে বরাবর একটার পর একটা আঘাত করে যাচ্ছিলাম। আমার এককটা মারে কাটাগাছের মতো পড়ে যাচ্ছিল ছেলেগুলো।
হাতের সুখ মিটিয়ে মেরেছি যতক্ষণ পারা যায়।
আমারও কিছু ছড়ে কেটে গিয়েছিল। কিন্তু তা খুবই সামান্য।

৬.
টিনাকে বলেছিলাম ঘটনাটা।
'বলিস কি?'
শুনে আঁতকে উঠেছিল।
টিনা প্রথম দিকে আমার সঙ্গে কেন যেন মিশতে চাইত না। ওরা বাবা যাকে কখনো কোনো সম্বোধনে তেমন একটা ডাকি নি। তিনি আমাকে তার নিজের মেয়ের চেয়ে একটু বেশিই আদর করতেন বলেই মনে হয়। টিনা পরে বলেছিল, 'এমন হিংসা হত, মনে হত তোকে গলা টিপে মেরে ফেলি।'
আমি হাসতাম।
'মেরে ফেললে না কেন?'
'তা কী করে হয়– তোর মতো এমন ব্রিলিয়ান্ট ছেলেকে মেরে ফলব। তোকে আমার একটা কারণেই ভয় লাগত। সে কী জানিস?'
'কী?'
'তুই যে খুব ভালো ছাত্র ছিলি।'
'তাতে কী?'
'ওটাই অনেক কিছু। মজার ব্যাপার হল তুই ভালো ছাত্র এই নিয়ে আমার কোনো হিংসা হত না, কেবল তোকে বাবা একটু বেশি আদর করত এটাই আমি সহ্য করতে পারতাম না। তুই তো জানিস আমি ছোট বেলা থেকে এমন আদুরে একটা মেয়ে ছিলাম কিন্তু কেউ সেটা বুঝত না। কোহিনুর খালা আমকে আদর করত খুবই কিন্তু আমার মন ভরত না। আমি তোকে দেখতাম দিন দিন তুই কেমন অন্য রকমের একটা মানুষ হয়ে উঠছিস। তোকে তোর বয়সের চেয়ে একটু বয়স্ক মনে হত। চেহারায় তো না। তুই তো এভার গ্রিন একটা লোক। কিন্তু মুখের ভেতর একটা ভাব এসে গিয়েছিল সেই তখনই। আমার বান্ধবীরা তো বলতই, তোর ভাইটা এমন মুডি।'
'কোন বান্ধবী?'
'প্রায় সবাই।'
'যেমন?'
'যেমন আবার কী। সবাই।'

‘একটা নাম অন্তত বলো।’
‘কে না– রেশমি, রূপশ্রী, মাধবী, মুনিয়া।’
‘মাধবী আর মুনিয়া তো তো দুই বোন।’
‘হ্যা।’
‘রূপশ্রী মানে রত্নদার বোন।’
‘ও বাবা! তুই দেখি সবাইকে চিনিস।’
‘কেন রত্নদাকে না-চেনার কী আছে।’
রত্নদীপ ভট্টচার্য আমার ছোটবেলার আরেক নায়ক। ভালো গান গাইত। ভালো ফুটবল, ক্রিকেট খেলত। দুটো বৃত্তি পেয়েছিল। সেই প্রবল প্রতিভা কেবল প্রেমের জন্য শেষ হয়ে গেল। তার প্রেমিকা শানু আপাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পর শানু আপা বিষ খেয়ে মরে যায়। রত্নদীপ পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল অনেকদিনের জন্য। তাকে সেই সময়ে আমি দেখেছিলাম। তার আগে লেখাপড়ায় খারাপ ফল করতে শুরু করে। ম্যাট্রিকে সবাই ভেবেছিল বোর্ড স্ট্যান্ড করবে। সেখানে রত্নদীপ কোনো মতে ফার্স্ট ডিভিশন পায়। তারপর তো শানু আপার বিয়ে। শানু আপার বর মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ছিল। শানু আপাকে নিয়ে চলে যাবে দেশের বাইরে। শানু আপা একদিন পালিয়ে ছুটে এল রত্নদীপের কাছে। তাদের একসঙ্গে ধরে ফেলে শানু আপার দেবর। রত্নদীপকে হয়তো মেরেই ফেলতো। রত্নদীপপের বাবা আওয়ামী লীগের একসময়কার লিডার। শুধু তা-ই নয়, দেবপ্রতিম ভট্টচার্যের মতো ভালো লোক এলাকায় আর একটাও ছিল না। ভেতরে ভেতরে দেবপ্রতিম হাড়মাংসে কমিউনিস্ট। রত্নদীপ তার বাপকে বলেছিল, শানু আপাকে বিয়ে করবে। দেবপ্রতিম রাজিই ছিলেন। ‘আমার কাছে হিন্দু-মুসলমান বলে কিছু নেই। তুই ভালো করেই জানিস। কিন্তু শানুরা মানবে না। আমাদের আত্মীয় স্বজনরা মানবে না। এলাকার লোকেরাও মানবে না। কিন্তু জীবনটা তোর। তুই যা ভালো বুঝিস তা-ই করবি।’
রত্নদীপ তার প্রতিটা কাজ বাপকে বলে করত। কোথায় হায়ারে ফুটবল খেতছে যাচ্ছে বা যাবে, রাজি হবে কিনা– সব বাপকে জানাত। তার বাপভক্তিও ছিল এলাকায় বিখ্যাত। শানু আপার ভাইরা এই সুযোগটাই নিল। তারা এসে দেবপ্রতিমকে ধরল ছেলেকে বোঝাতে। দেবপ্রতিম সবার সামনে ছেলেকে বললেন, সে কী করবে। রত্নদীপ সবাইকে অবাক করে বলল, তার বাবা যা বলবে সে তাই করবে। বাপ বলল, সে যা বলবে। এই কথার সময় শানুর ভাইয়েরা নাটক বন্ধ করতে বলে।
রত্নদীপ দেখল এরা আরেকটু হলেই তার বাপকে অপমান করতে পারে। বাপের যাতে কোনো অপমান না হয় সেজন্য সে-ই সিদ্ধান্ত দেয়। সবাইকে জানায় যে, সে শানুর ব্যাপারে এখন থেকে আর কোনো রকম আগ্রহ দেখাবে না। সে বিয়েতে কোনো রকম ঝামেলা করবে না।
তারপর কয়েকটা দিনের জন্য ইন্ডিয়ায় চলে যায়। ফিরে আসে বিয়ের ঠিক পরে পরে। শানু বিদেশ যাওয়ার সবকিছু গোছানো হয়ে গেছে। এক রাতে শানুই রত্নদীপরে সঙ্গে দেখা করতে চায়। রত্নদীপ রাজি হয়। তারপর এক বন্ধুর বাড়িতে দুজনের দেখা হয়। কিন্তু ততক্ষণে শানুর দেবর সেই বাড়ি ঘিরে ফেলে লোকজন নিয়ে। শানুর নামে জঘন্য কথাবার্তা বলতে বলতে তারা শানুকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। শানুর স্বামী সে সময় ঢাকা গিয়েছিল কী একটা কাজে। শানুকে দুদিন আটকে রাখে। শানু বিষের কৌটা অনেক আগে থেকেই তার কাছে রেখেছিল।
পরে জানা গেল, রত্নদীপের সঙ্গে প্রেম হওয়ার পর থেকেই বিষের কৌটা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত। শানু কোনো রকম অপমান সহ্য করতে পারত না। কোনো দিন শানু কাউকে একটা মন্দ কথা বলে দেখেনি। তার মতো ভদ্র নম্র মেয়ে হয় না। দেখতে খুব সুন্দর না হলেও তার ভেতরে অদ্ভুত এক নজরকাড়া স্নিগ্ধতা ছিল। কখনো জোরে কথা বলত না, জোরে হাসত না, কোনো রকম রংঢং করত না। একটা

সাদাসিদা ব্যাপার ছিল। কেউ কখনো তাকে দামি কাপড় চোপড় পড়তে দেখেনি। অথচ শানুরা ছিল এলাকার সবচেয়ে টাকাপয়সাওয়ালা পরিবারের একটা।

আমি বুঝতে পারি না। তাদের দুটো পরিবারই ওই এলাকায় সবচেয়ে নামি পরিবার ছিল । তাদের মধ্যে কোনো রেশারেশিও ছিল না। শানুর বাবা মুক্তিযুদ্ধের সময় দেবপ্রতিমের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করেছেন। দেবপ্রতিম তার বাপের মাধ্যমেই ভারতে চলে গিয়ে ফের যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। এলাকা যুদ্ধের পর যে লোকটার সঙ্গে প্রথম এসে জড়িয়ে ধরেন দেবপ্রতিম তিনি শানুর বাবা সাইফুল কাশেম গাজি। গাজি বাড়ির সঙ্গে ভট্টচার্য বাড়ির কোনো বিরোধ ছিল না। গাজির গ্রামের এলাকা ছেড়ে রাজশাহী শহরে চলে এল।

গাজির পরিবারের ব্যাবসা বাণিজ্যে ফুলেফেঁপে বড়লোক হতে লাগল তখনও যাওয়া আসা ছিল দুই পরিবারের ভেতর। এর ভেতরেই রত্নদীপ আর শানুর কখন একে অন্যকে ভালোবাসল তা কেউ বুঝতে পারেনি। এমনকি শানুকে বিয়ে না দিতে চাইলে তা কেউ বুঝতে পারত কিনা কে জানে। এতটাই গোপন ছিল দুজনের প্রেম। রূপশ্রী বলত সে নিজেও কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি রত্নদা এইভাবে শানুকে ভালোবাসত।

'রূপশ্রী তোর কথা খুব বলত।'

'তাই নাকি! কী কারণে?'

'তা তো সে-ই জানে।'

'তোমরা না বান্ধবী।'

'তাতে কী? আমি কী তার মনের কথা জানব না কি।'

'তাহলে কেমন বান্ধবী?'

'মানে?'

'মনের কথা জানা নেই তারা কী একে অন্যের বন্ধু হয় নাকি?'

'বন্ধু তো কত রকমেরই হয়।'

'তা হয়। কিন্তু আসল বন্ধু তো সে যার মনের কথাটা তোমরা জানা, তোমরা মনের কথা তার জানা, তুমি জীবনে কী চাও সে জানে, সে কী চায় তুমি জানো। এটা হল বন্ধুত্বের মিনিমাম লেভেল। তারপর বিপদে আপদে সাহায্য করা, সমস্ত কিছুতে থাকা এটা তো আছেই। আমি একটা জিনিস ভেবে দেখেছি। ধর তোমরা সঙ্গে কারো দশ বছরের সম্পর্ক, একদিন কোনা একটা কারণে সে এমন একটা কথা বলল, এমন একটা কাজ করল, তাতে তোমরা মনে হল, এই ছিল তাহলে ওর মনের কথা, এই হল আসল চেহারা। এটা মনে করে, তুমি তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করে দিলে। তাকে আর বন্ধু বলেই গণ্য করলে না। তাহলে ওই যে দশ বছরের এত আন্তরিকতা সৌহার্দ্য সব শেষ হয়ে গেল? তার কোনো মূল্য নেই? আমি মনে করি, আছে। আমি মনে করি সবার মানবিক দুর্বলতা আছে। সবার ভেতরে শয়তান আছে, সবার ভেতরে বাস করে ভয়ংকর খুনি একজন, পরশ্রীকারত, হিংসুক প্রতিহিংসা প্রতিশোধপ্রবণ একটা মানুষ– সেই মানুষটা দশ বছরে একবার বেরিয়ে আসতে চাইবে না? আর তার জন্য বাদ বাকি সব কিছু শেষ। মানুষের দীর্ঘদিনের সম্পর্ককে কি এক বালতি দুধে একটা ফোটা চোনার মতো, একটা কথা, একটা কাজই নষ্ট করে দিতে পারে? মানুষের সম্পর্ক কি সাদা শার্টের মতো? মানুষকে এই সব বস্তুগত তুলনা দিয়ে ব্যাখ্যার জায়গাগুলি থেকে যখন বের করে নিয়ে আসা যাবে তখনই মানুষের সঙ্গে বস্তুগত জায়গা থেকে দেখা পার্থক্যগুলি ধরা পড়বে। মানুষের মানবিক দুর্বলতা বাদে যে-টুকু মানুষ তা-ই তার মনুষ্যত্ব।' টিনার সঙ্গে রাজশাহীতে ওর বাসায় এই কথাগুলি বলছিলাম।

এসব কথার মাঝখানে টিনা বলল, 'তোর সেই আরিয়ানার খবর কী?'

'এবার আসার আগে দেখা হয়েছিল।'

‘কী বলল?’
‘কী আর বলল।’
টিনা বলে, ‘বলতে না চাইলে বলবি না।’
‘আহা বলবার মতো তো কিছু হয়নি যে বলব। লন্ডনে দেখা হল, বলল, আজকে রাতে ডিনার করাবে আমাকে। ওর মামার বাসায় ছিল, এখন থেকে ও লেভেল শেষ করে এসেছে। একটা ফাস্টফুডের দোকানে কাজ করছে।’
‘তুই কী বললি?’
‘কী বলব, আমি একটু থেমে বলি, রাজি হলাম না।’
‘অপমান করলি।’
‘অপমান করার আমি কে?’
‘তা ঠিক, তোরা কাছে কারো মান থাকলে তো অপমানের প্রশ্ন ওঠে।’
‘এটা কেমন কথা বললা?’
টিনা দেখল কথাগুলি জমছে না।
বলল, ‘ঢাকায় গিয়েছিলি?’
‘না।’

৭.

আমি মিথ্যা বললাম। বললেই, বীণা আন্টির কথা জিজ্ঞাসা করবে। আমি কিছু বলতে চাই না। বললাম না যে, পঞ্চাশোর্ধ বীণা আন্টিকে দেখে এত বছর পরও সেই আগের মতোই মুগ্ধই আছি। এখনো যে গড়ন! হিন্দি কোন একটা গানে ‘ফিগারওয়ালি’ বলে একটা কথা শুনেছিলাম, বীণা অন্টির জন্য এর চেয়ে যুৎসই আর কোনো কথা খুঁজে পাইনি। আমাকে দেখে কোনো কথা না বলে প্রথমে জড়িয়ে ধরলেন তারপর আশ্লেষে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেলেন। আমি তাকে বললাম, দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকি না কেন আমি তার কাছেই ফিরে ফিরে আসব। লন্ডনে যাওয়ার আগেও তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম।
বীণা আন্টি বলেছিল, ‘তোমার এই পুরোনো রোগ আর গেল না। তোমাকে তো বলেছি আমি বিয়ের করব সত্তর পার হলে, যখন আমার কোনো ক্ষমতা থাকবে না, তখন। আমার কাছে বিয়ে মানে মানসিক নিরাপত্তা যখন আমার কাছে কেউ আসবে না।’
ডাক্তারি পাস করে বীণা আন্টি সেক্সোলজি নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন। বীণা আন্টির দোহারা লম্বা শরীরটা আরো বেশি হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। কোথাও কোনো শিথিলতা নামেনি।
বললেন, ‘কোহিনূরের খবর কী?’
‘জানি না।’
‘রাজশাহীতে না দিনাজপুরে আছে?’
‘দিনাজপুরে।’
‘ওকে তো সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারিস। হাদিদ সাহের সঙ্গেই তো আছে?’
‘জানি না।’
আমি আসলে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাইছিলাম না। আমি আরেকটু গুছিয়ে নিতে পারলেই আম্মাকে বলব, আমার সঙ্গে ইউকে যাওয়ার জন্য। কথাটা বীণা আন্টিকেও বললাম না।
আমি তো টিনার কাছে অনেক কথাই বলতে চাইতাম। মনে হত, পৃথিবীতে ওই আমাকে একটু হয়তো বুঝতে পারে। কিন্তু ওর প্রতি আমার মুগ্ধতাকে ও-ও ভুল বুঝেছিল।

একদিনের ঘটনায় আমি এত দমে গিয়েছিলাম। ও আমাকে বলেছিল, নিজেক কষ্ট না দিয়ে আমি চাইলে রাতের বেলা ওর কাছে আসতে পারি। সেসময়টায় কয়েকদিন পরপরই আমি দেখতাম আমার লুঙ্গি আঠার মতো আমার শরীরে সেটে আছে। ওঠাতে গেলে লোমে টান পড়ছে। পট পট শব্দ হচ্ছে। মনে হত চামড়া ছিড়ে যাবে। আর বিছানায় দাগ পড়ত। দাগগুলো টিনার চোখে পড়েছিল। কাউকে না বলেও পারি না। কেন এসব ঘটছে বুঝতে পারছিলাম না। কেবল সেভেনে উঠেছি। আর এই যন্ত্রণাটা শুরু হল। আর একটা ব্যাপার আমি টের পেলাম আমি সবার চেয়ে কেমন যেন অন্য রকম হয়ে উঠছি। যেমন আমার গোয়ের রঙ গোলাপি ধরনের ফার্স। নিজের কাছেই নিজেকে মেয়ের মতো লাগত। ছেলেদের এমন মেয়েলি রঙ হলে কেমন লাগে?

ঠিক বুঝতাম, আমাকে নিয়ে এসব আলোচনা চলছে। আর আমি কেন এমন হলাম সেও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলাম। কেবল আম্মা দেখতে অনেকটা লম্বা ছিলেন কিন্তু আরো অনেক পরে বুঝতে পারি আসলেই অন্য একটা ব্যাপারও আছে।

তত দিনে আমি অনেক কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছিলাম। মামার কাছে জানলাম, তিনি আমার শিল্পসাহিত্যে আগ্রহ দেখে বলেছিলেন, 'পৃথিবীর আধুনিক লেখা পড়তে হলে মাত্র দশজনের লেখা যেন পড়ি। কবিতায় ইয়েটস, ফার্নান্দো পাসোয়া, সি.ভি কাভাপি, হোর্হে লুই বোর্হেস, আর গল্প উপন্যাসে মার্সেল প্রুস্ত, টমাস মান, ফানৎস কাফকা, জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ আর উইলিয়াম ফকনার।'

আমি বললাম, 'মাত্র দশজন?'

'এদের পড়লেই তুমি দিনে দিনে একহাজার জনের কাছে যেতে পারবে। কার কাছে নয় বল– শোপেনহাওয়ার কি নিৎসে। নিৎসের কাছে যদি তুমি যাও তুমি ফিরে আসবে জরথ্রুস্তের কাছে আর জরথ্রুস্তের কাছ থেকে তুমি ফেরদৌসীর কাছে।'

বলে দিয়েছিলেন, 'বাল্মীকি, ব্যাসদেব, হোমার, ভার্জিল, ওভিদ, দান্তে, ফেরদৌসী, সার্ভান্তেস, শেক্সপিয়ার, গ্যেটে, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ। দ্য গ্রেটেস্ট ডজন। ভারত দিয়ে শুরু ভারত দিয়ে শেষ। সাহিত্যের ইতিহাস ধ্রুপদী বলতে যা বোঝায়। তারপর তোমার ইচ্ছা মতো তুমি যা খুশি পড়, কিন্তু আগে ক্ল্যাসিকস পড়া থাকলে বাকি সব জলের মতো বুঝে যাবে। এসময়ের যে কোনো সাধারণ মানের লেখকের লেখা কোনো বইয়ের এজায়গা ওজায়গার দুটো সংলাপ, এখান ওখান থেকে তিনচার লাইন পড়লেই বুঝতে পারবে গতি কোন দিকে।'

বললাম, 'আপনি ইদানিং একজনের লেখা যে খুব পড়ছেন, তার নামটা যেন কী?'

'ও হ্যা, মিলান কুন্ডেরা।'

'কেন?'

'আমার কাছে মনে হয়েছে, উপন্যাসের যে গতিতে এই সময়ে আসার কথা ছিল, তার যোগ্য প্রতিনিধি তিনি। কিন্তু আমরা এসময় কুন্ডেরাকে ধরব উপন্যাস তো চলে গেছে টমাস পিনশেনদের কাছে। তারপর মার্কেজ-ফুয়েন্তেসরা তো আছেনই, অন্যদিকে ডেভিড মালুফরাও আছেন। কী সব কাণ্ড হচ্ছে না, বলবার মতো নয়। ওসব লেখা তো আমাদের এখানে আসেই না।'

মামার এক বন্ধু তাকে নিয়মিত লন্ডন থেকে চিঠি লিখতেন। তিনি এসব চিঠি থেকে আমাকে পড়ে শোনাতেন এই কথাগুলো। লোকটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সৈয়দ হকের সঙ্গে একসঙ্গে কিছুদিন পড়েছিলেন। সৈয়দ হকই তাকে ওইসব বইয়ের পাঠক করে তুলেছিলেন আর তিনি করেছিলেন মামাকে। বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে বছরে তিনচারটা বই পাঠাতেন।

আমার মন ভরে উঠল অ্যাডগার অ্যালেন পোর লেখায়। মনে হল, ঠিক আমি যা চাই তা-ই এই লোকটার কাছে পাই। আমি চাই পড়তে গিয়ে প্রতিটি বাক্যের শেষে যেন আমার গা ছম ছম অরে ওঠে। পরে আমি মেতে উঠি শালর্ক হোমসের কাহিনী নিয়ে। আমার কাছে এর চেয়ে মজার আর কোনো লেখা হতে পারে

না। মামা বলেন,'পো ঠিক আছে, হোমসও ঠিক আছে কিন্তু একটা বয়স পর্যন্ত।' মামার বইগুলি না থাকলে আমি যে কী হতাম আমি জানি না।

৮.

মায়ের সঙ্গে ক্লাস নাইনে পড়ার সময় ঢাকা যাই। বীণা অন্টির বাসায় উঠি। মামাই কোথা থেকে যেন তার ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন। আন্টির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমার চেনা পৃথিবীটা রাতারাতি বদলে গেল। আসলে ঠিক গেল না, এরপর থেকে কোনো কিছুকে আমি আর আগের মতো দেখতে পারছিলাম না। তারপরও নিশ্চিত হতে পারছিলাম না আমি আসলে কোনদিকে যাব।

সেবার ঢাকায় অনেকদিন কাটল বীণা আন্টির বাসায়। তিনি আমার কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জানলেন। বললেন, 'তোমাকে দেখে তো বোঝা যায় না এত অল্প বয়েসে এত কিছু খেয়াল করছ তুমি।'

আমি অনেক পরে বুঝি আমি তার কাছে সেই সময়ে গিনিপিগ ছাড়া আর কিছু ছিলাম না। তিনি পারে বলেছিলেন, আমার মন ও শরীরকে নিজের ল্যাবরেটরি বানানোটাই ছিল তার সজ্ঞানে করা এক এবং একমাত্র পাপ।।

তাতে কী লাভ কি ক্ষতি তার হয়েছিল আমি ঠিক তখনও জানতে পারি নি। অবশ্য এজন্য আমি বয়সের আগেই বয়স্ক হয়ে উঠেছিলাম। আমি জেনেছিলাম, সবকিছু বুক থেকে শুরু করতে হয়। তারপর মুখ এবং শেষে হাত। তারপর সেতুসংযোগ। নিজেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। কোনো স্তরেই ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। তাহলেই শরীরের সঙ্গে শরীরের মিশে তৈরি করে এক অপূর্ব প্রার্থনা। একে অন্যের ওপর উপগত হওয়ার উপাসনা জীবনকে মুক্ত করে সমস্ত ব্যথা-বেদনা থেকে। ক্লান্তি নয়; নতুন উদ্যমে বলীয়ান হয়ে ওঠে শরীর। গভীর ও মর্মস্পর্শী সঙ্গমে সঙ্গমে জীবনকে উদ্‌যাপন করতে হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়; পরিপূরক হয়ে ওঠাটাই হল এর কাজ। কোনো জয়পরাজয় নয়। হারলে দুজনেই হারে, আর জিতলে দুজনেই। ব্যর্থতা বিরক্তি আনে না; বিরক্তির জন্ম হয় ভুলভাবে ভালোবাসার জন্য। অতিরিক্ত কি অবদমন দুই-ই যেকোনো কামকে অর্থহীন করে দেয়। মহার্ঘ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। তখন সত্যিকারভাবে শরীরের ভেতরে শরীর জাগে। আত্মায় সত্তায় অন্য ঈপ্সিত সেই জনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। সেই মহামুহূর্ততে বোঝা যায় এই অনুভূতি খোদার সবচেয়ে সেরা দানগুলোর একটা।

জীবনের সমস্ত স্তরই সুন্দর। জীবন যৌবনের জন্য নয়। কেউ সম্পন্ন হয় না একেঅন্যকে ছাড়া। নারী ও পুরুষ দুজনে মিললে তবে মানুষ বলতে আমার যা বুঝি সেই মনুষ্যত্বের জন্ম হয়। তখনই মানুষ নামের সেই সমগ্র চেতনার জন্ম হয়। একাজটা নিজে নিজে যোগের ভেতর দিয়েও কেউ করতে পারে কিন্তু তা করাটা খুব সহজ কিছু নয়। আমি তো অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, পৃথিবীর সমস্ত যোগী, মহা পুরুষের বাইরে ভোগী অন্তরে যোগী । আর এই পৃথিবীর দেবতা শিব নয়, কামরতি।

বীণা আন্টি বলেছিলেন, 'বলতো কার কাবিতায় আছে?'

'কার?'

'নজরুল! নজরুল!! এব্যাপারগুলি তাদের মতো লেখকদের বুঝতে কষ্ট হয়নি। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। এজন্য তাদের কতটুকু ফ্রয়েড পড়তে হয়েছিল গড নোজ।'

বলতেন, 'হ্যা, বড় হওয়ার অনেক আগেই তুমি একটু আগেই বড় হয়েছিলা।'

'কারণ আমি জানি আমার জন্ম কীভাবে?'

'কোহিনূর তোমাকে সব বলেছে!'

'আপনার থেকে জেনে তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলাম। স্রেফ এজন্যই আমি আম্মার কোনো দোষকে আর দোষ বলে মনে করি না। সি সাফারড অ্যা লট।'

'তা ঠিক, ওর সাফারিংয়ের কোনো রিমিডি হয় না। হাদিদ ফাকারটা কদিন ভালোমতো মৌজ করে নিক। দেন, এমনিতেই মোহ কেটে যাবে।'
আমি বলি,'এ মোহ কাটে না। আমাকে দেখেন না। এলিজাবেথ টেইলরকে দেখেন না।'
'আমি কখনোই এদের কাউকে সেক্স ম্যানিয়াক বলব না।' তারপর তিনি একটু থেমে বলেন, 'তুমি কত সহজে এসব কথা বল।'
'বলব না কেন! এগুলির ভেতর দিয়েই তো আমাকে যেতে হয়েছে। আমার দেশে গণধর্ষণ হয়েছে। সেই গণধর্ষণের আরেক ধরনের ফল আমি। আমি যে বীজের থেকে উঠে আসা গাছ সেখানে কোনো প্রেম নেই। সেখানে পাশবিকতা ছাড়া আর কোনো কিছু নেই। নইলে সে লোকটা আর কোনোদিন ফিরে এল না কেন? কেবল অভিনয় করল ভোগকে নিশ্চিত করতে? সিডিউস করল জীবনের মধু পান করার জন্য?'
'এটা ঠিক না। গুলশান খান কিন্তু কোহিনূরের প্রেমেও পড়েছিলেন। যুদ্ধটা আর একটু দীর্ঘায়িত হলে কিন্তু আমার সন্দেহ তোমার মা সুবুক্তগিনের কাছে ফিরে যেতেন কিনা। মানে সুবক্তগিন যদি বেঁচে থাকতেন।'
'কেন?'
'কেন আবার! গুলশান খান লোকটা রাতকে ভোর করে ছাড়তে পারত! ওই কাজে সে অক্লান্ত ছিল। তার আদিপুরুষ বলে তাতার বংশের লোক। মানে বোঝতো– মোঙ্গল। মোঙ্গল থেকে আসা। কোথায় দাগেস্ত ান, কোথায় ইরান তারপর ভারতবর্ষ তারপর পাকিস্তান। সেদিক থেকে আমি বলব পৃথিবীতে যুদ্ধ মানুষের ভেতরে নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। মানুষ সংঘাতের ভেতর দিয়ে তার সভ্যতাকে জানতে পেরেছে। আর ব্যক্তিগত জীবনেই তুমি দেখ না, তোমার সঙ্গে কারো ঝগড়া না হলে... তুমিই তো মায়াবতীর প্রতি কোনো আগ্রহ বোধ করতে কিনা। বিরোধই মিলনের উৎস দ্বন্দ্বই মিলনকে ছন্দ দেয়। 'বাবুরনামা' পড়েছো?'
'মামার কাছে ছিল। পড়া হয়নি।'
শুনে বলেছিলেন, 'এই হল আমাদের সমস্যা। অন্যেদের জানব কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে। বিদেশের সঙ্গে আমাদের এটা একটা ব্যাসিক পার্থক্য তারা নিজের জেনেছে আগে তারপর অন্যদের জেনেছে আর অন্যদের জেনে আরো ভালো করে নিজেদের জেনেছে। কিন্তু জীবনটা আসলেই নদীর মতো ভাগ হতে হতে সে জানে না, আসলে তার উৎস কোথায় তার সামনে তখন একটা লক্ষ্য, লক্ষ্যটা আসলে নেশা হয়ে ওঠে: সমুদ্রে যাবার নেশা। আর মানুষের জীবনেও কারো যদি নিজের লক্ষ্যটা নেশা না হয়ে ওঠে তাতে সে আসলে কিছু করতে পারে না। অমোঘ করে ফেলতে হয় নিজের জন্য নিজের কাজটাকে। আর এর জন্য দরকার সময়। যারা কাজ পারে তাদের জন্য কোনো কিছু যদি অভাব হয় তা হল সময়। যাদের অগাধ সময় আছে তাদের আর কিছু নেই।'
'সময় নষ্ট করলে বাঘের সঙ্গে লড়া যায় না। আর সময়মতো ও জায়গামতো হিট করলে বাঘেরও সাধ্য নেই যে জেতে। মামা কিন্তু এই কথাটা বলেছিলেন। আপনিই বলেন এই কথাটাকি কম? 'বাবুরনামা' না পড়লেও এই কথাটা মামার কাছ থেকে শুনেছিলাম।'
'হঠাৎ বাঘের কথা কেন?'
'বাবুর মানে বাঘ না?'
'হবে কোনো কিছু বাঘ সিংহের একটা।'
বুয়েটে পড়ার সময় জয়দীপ বলত, 'লড়তে পারে বাঘে, আর করতে পারে ঘোড়ায়।'
'কী করতে পারে পারে? কাম?'
'কোনো কাজ– নাকি সেক্স?'
'দুটোই।'
'কেন সুনীল তো বলে, পুববাংলার মানুষেরা বড় দার্শনিক তারা কাজকে কাম বলে।'

বীণা বলেন, 'কথাটা কিন্তু সত্যিই ওজনদার।' বীণা আন্টি আমার দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণভাবে হেসেছিলেন। তিনি জানেন আমি খুব ভালোমতো জানি এরপর কী করতে হবে। আই অ্যাম নাও স্ট্যান্ডিং বিফোর দ্য লেটেস্ট ভারসন অব *দ্য বিফোর মিডনাইট স্কলার*।'

বীণা আন্টি বলতেন, 'ইস্টের লোকজন সেক্স নিয়ে এত শিক্ষিত ছিল আর সেখানে এখন কী ভয়ংকর ইগনোরেন্স। অথচ স্রেফ দৃষ্টিভঙ্গিটা পালটালেই অনেক কিছু হয়ে যায়। আবুল হাসনাতের পর ঠিক মতো বিষয়টা আমাদের কাছে তুলে ধরতে একটা লোকও এগিয়ে এল না। অনেক সংস্কারই ভেঙে দেওয়া যেতে। অনেক ধারণাকে নিমিষেই মিথ্যা বলে বুঝতে পারত লোকে। আমি দেখেছি তো অনেক দিন ধরে যেটা তুমি বিশ্বাস করে আসছ সত্য বলে স্রেফ একদিনে তুমি টের পেলে যেটা একেবারেই মিথ্যা। ব্যাস তোমার কাছে কিন্তু সেই সত্যের কানাকাড়িও দাম রইল না। এতটুকুও না।'

৯.

মামা একদিন অনেক কথা বলেছিলেন। বলেছিলে, 'আমি জানি তুমি একদিন একটা নিজস্ব ভিশন তৈরি করবে। এবং সে অনুযায়ী তুমি তোমার মিশনও তৈরি করতে যাচ্ছ। যা কর না-কর প্যাশন থাকতে হবে। প্যাশনেটলি করতে হবে। ভিশস-মিশন-প্যাশন– এই তিনিই হল জীবনের সার। সে যাই হোক। তোমার জীবনটা আর সবার মতো হবে না। আমরা যেভাবে বিভিন্ন সম্পর্কটম্পর্ক দিয়ে বাধা থাকি তোমার জীবন কিন্তু এমন হবে না। কখনো কোনো সম্পর্ক জোর করে তৈরি করতে যাবে না। সম্পর্ক নিজের গতিতে থাকবে। নিজের গতিতে ছুটে যাবে। আর জীবনে যদি তেমন কোনো সম্পর্কে জড়াও এবং তাকে যদি ধ্রুব বলে ধরে নেও, একটা পর্যায়ে দেখবে সে আর তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে পারছে না। সেটাকে একেবারেই স্বাভাবিক ঘটনা বলে ধরে নিতে পারো। তার ওপর রাগ করা বা তাকে গালি দেওয়ার কোনো মানে নেই। কখনো কি ভেবেছ, তোমার ছোটবেলার খুব ভালো বন্ধুর সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি। হয়তো আর কোনোদিনও হবে না। সেই সর্ম্পকগুলি তো কোনো রাগের কারণে চলে যায় নি, এমনি এমনি চলে গেছে। এমনও হতে পারে তার কথা তুমি মনে রেখেছ সে তোমার কথা একেবারেই ভুলে গেছে। সম্পর্কগুলি এমনই, সম্পর্ককে লোকে অনেক বড় করে দেখতে চায়। হ্যা, যারা খাবেদাবে ঘুমাবে একে অন্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকবে, বুক জুড়ে মমতা থাকবে, তার জন্য সম্পর্কগুলি গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু যে স্বাধীন ও মুক্তমানুষ হতে চায় তার কাছেও সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা নিয়ে সে চলতে পারে না। তুমি চলবে, তোমার সমান্তরালে যদি সে না আসতে পারে তবে সে তো পিছিয়ে পড়বে। আর পিছিয়ে পড়া মানুষ তো সামনে এগিয়ে যাওয়া মানুষের সঙ্গী হতে পারে না। একজন পাহাড় চূড়ায় পৌঁছে গেল; আর একজন পাহাড়ের পাদদেশে পড়ে রইল তাদের ভেতরে কথা হতে পারে না। হয় যে উঠেছে তাকে নেমে আসতে হবে, নইলে যে নিচে পড়ে আছে তাকে উপরে উঠে আসতে হবে। নইলে কেউ কাউকে বুঝতে পারবে না। নিচে পড়ে থাকা মানুষের জন্য তুমি সহানূভূতিশীল হতে পারো, তার জন্য তোমার বেদনাবোধ থাকতে পার– কিন্তু সে তোমার কখনোই পথের সাথী হতে পারে না। তাই সম্পর্ক নিয়ে বেশি কিছু ভাবার দরকার নেই। তোমার যেটা কাজ তাই করটা দরকার। সম্পর্ক যদি হয় তাহলে সেই কাজের সূত্রে হবে। তবে হ্যা, প্রেমট্রেম হলে অন্য ব্যাপার। এক্ষেত্রে কিছু কোনো সূত্রটূত্র কাজে লাগে না। কাজে লাগে না বন্ধুত্ব বা শুভার্থী যারা তাদের জন্যও। কিন্তু তোমার সহযাত্রী তোমার মিশনের লোককে কিন্তু তোমার সমান তালে এগিয়ে যেতে হবেই।'

মামা কেন আমার সম্পর্ক এমন ধারণা করেছিলেন আমি জানি না। আমি তাকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম। যেমন স্কুলের বইয়ে এককথায় প্রাশ পড়তে গিয়ে– যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে- আস্তিক, যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না– নাস্তিক। আমার জীবনে এই রকম দুটো পরপর কোনো ঠিক বিপরীত

ধরনের কথা আমি সেই প্রথম শুনি আর প্রথম জানি যে খোদায় মানুষ বিশ্বসা করে না– এমন আবার মানুষ হয়! আমি মামাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'পৃথিবীতে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এমন মানুষ আছে?'
'হ্যা, কত আছে?'
'কোথায় আছে?'
'সবদেশেই আছে।'
'যেমন একটা দেশের নাম বলেন?'
'রাশিয়ায়। রাশিয়ার লোকরা কমুনিস্ট।'
'কনুনিস্ট কি মামা?'
'এসব এখন বুঝবে না। বড় হয়ে বুঝবে।'
আম্মাকে দেখতাম মাঝে মাঝে বিভিন্ন খবর, টিভিতে রেডিওতে শুনে বলে উঠছেন এই হল মহামানুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পার্থক্য।
আমি মামাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মানুষ কেন অসাধারণ হয় না? কেন আর মহানুষরা পৃথিবীতে আসে না?'
মামা এর কোনো উত্তর দিতে পারেনি।
আর একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'পতিতা কী?'
খবরের কাগজে পতিতাদের নিয়ে কী একটা খরব যেন বেরিয়েছিল: পতিতাবৃত্তি করার দায়ে তিনজন নারীসহ দালাল গ্রেফতার। এক কলামের ছোট একটা খবর। আমি বুঝতে পারছিলাম না পতিতাবৃত্তিটা কী, আর কেন এর জন্য পুলিশে ধরবে। ক্লাস ফাইভে ফার্স্ট হওয়ার জন্য বার্ষিক ক্রীড়া ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দুটো বই পেয়েছিলাম। একটা হল 'ইসলাম ও সমরিক জীবন' আর পেয়েছিলাত সাদ'ত হাসান মান্টোর 'ডার্লিং ডার্লিং ডার্লিং'। সেখানে একটা গল্পের শেষটায় একটা কথা ছিল, তারপর থেকে সে দেহবিক্রির লাইসেন্স পেয়ে গেল।
আমি কোনোমতেই বুঝতে পারছিলাম না দেহ বিক্রি করে কীভাবে– আর এর সঙ্গে লাইসেন্সটাওবা কি ভাবে পায়। লাইসেন্স তো গাড়ি চালাতে লাগে।
বিশ্বাস, মহামানব আর পতিতাবৃত্তি বা দেহব্যবসা– এই তিনটি ছিল আমার জীবনের একেবারে শুরুর দিকের রহস্য; আর এই বয়সে এসে মনে হচ্ছে এর কোনোটারই কোনো সমাধান নেই। মামা অবশ্য বলেছিলেন, 'ফ্রম হোয়েন এভরি পারসন অব দ্য ওয়ার্ল্ড ফিলস দ্যাট দে আর ডিসঅ্যাবল টু ডু এনি হার্ম টু এনি পিপল দেন উই উইল গেট অ্যা নিউ ওয়ার্ল্ড। এভরি ওয়ান ফিলস দ্যাট হি ইজ ডিস্যাবল টু ডু এনি হার্ম ইভেন হিস এনিমি– হু উইল ফিল ইট ফ্রম হিস হার্ট হি উইল বি অ্যা সুপার হিউম্যান বিং।'
তারপরও ঈশ্বর, পতিতা আর মহামানব–এই তিনটি শব্দ-রহস্য দিয়ে আমার ভেতরের মনে প্রথম জিজ্ঞাসার শুরু। এবং পরে আর কখনো তা খুঁজে দেখতে যাইনি। একসময় মনে হত, ঈশ্বর আর মহামানবের মাঝখানে একটা বাধা কি পতিতা? কিন্তু আমি এখন নিশ্চিত নই কে পতিতা আর কে পতিতা নয়? এটা এখন আমার কাছে কেবল একটা স্ত্রীবাচক শব্দ নয়। আমি অনেক ছেলে পতিতা দেখেছি যারা আক্ষরিক অর্থেই পতিতা। আবার ব্যবসা বাণিজ্যে, আদালতে, খবরের কাগজের অফিসে অফিসে যারা নিজেদের বিকিয়ে দেয় টাকার জন্য তারাও তো পতিতা।
আসলে ঈশ্বর আর মহামানবের মাঝখানে যাওয়ার এই বাধা– যে কে কতখানি পতন এড়িয়ে তার দিকে যেতে পারে। আসলে তো মানুষই তার মনের বিরাটত্বের কাছে পৌঁছাতে পারলে নিজেই ঈশ্বর হয়ে ওঠে। ওই আনাল হকের মতো। সে ফানাফিল্লাহ হয়ে যায়। এসব কথা অবশ্য অনেকের পছন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু আমার একটা বয়সে এসে মনে হয়েছিল মানুষ হয়ে ওঠে মহামানব, শয়তানের আসল মানে হয় পতিত; বেশ্যারাই বরং পতিতা নয়; আর ঈশ্বর তো পরমপুরুষ। কিন্তু এখন তাও মনে হয় না। মনে

হয়, এগুলি এখন অন্তত আমার জীবনে আর কোনো বিবেচ্য বিষয় হিসেবে নেই। আর এগুলি বোঝার জন্য আমি দিনরাত পার করে দিয়েছি তাও নয়। আমি কেবল ইতিহাসটাকে বুঝতে চেয়েছি। কীভাবে মানুষ আর এই সভ্যতা আজকে এই অবস্থায় এল। অনেক কিছু বদলেছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের ভেতরে এখনও অনেক আদিম অন্ধকার রয়ে গেছে। অন্ধকারগুলি দূর করতে সে কোথায় যাবে? কীসের সাহায্য নেবে? নাকি এগুলি দূর করার আদৌ কোনো দরকার আছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। কী এসে যেত, মানুষ যদি একেবারে জংলিই অবস্থা থাকত? তারা যেভাবে বাঁচে তাদের বাঁচাকে কী অসভ্যতা বলা যায়? তাদের মমত্ববোধ আর সভ্যতার কেন্দ্র থেকে মানুষের হিংসা জিঘাংসা– কোনটা আসলে সভ্যতা? যেখানে মমতা সেখানেই সে মানবিক। মানুষ তার মমত্বের জায়গা সভ্য, তার খাঁটি কল্যাণকামী আনন্দকামী স্বভাবের জায়গায় সভ্য।

মনে না হওয়ার কারণ নেই যে মানুষ তার প্যাগান স্বভাব দলবেঁধে আনন্দ করা, নারীপুরুষ ভেদ ভুল যাওয়ার জায়গায় তো সে সভ্য। আবার মনে হয় সব রয়ে গেছে যে ধার্মিকও সে ভোগীও। তার স্বভাবের দুটোই সত্য। কোনোটাই তার প্রবৃত্তির বাইরে যেতে পারে না। ধর্মটা বিশ্বাসের চেয়ে প্রবৃত্তি হয়ে আছে বলেই তা মোচনীয় নয়। এ একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আমি যখন নীতিনৈতিকতার কথা ভাবি বুঝতে পারি– নীতিনৈতিকতার সঙ্গে জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। একজন মানুষ অনেক কিছু সম্পর্কে জানেন এবং রীতিমতো তাকে ওই বিষয়ের বিশ্বকোষ বলা যায়, কিন্তু তিনি কোনো সুন্দরী নারী বা বিপুল অংকের অর্থ বিত্তের সমানে নাজুক হয়ে যেতে পারেন। মেনকা উর্বশী রম্ভারা সে আজো আগের মতোই আছে কেবল নাম বদলে গেছে। নিজেকেও আমি নির্লোভ কী হিসেবে বলি, কেউ তো আমার সামনে কোটি টাকা রেখে দেখেনি।

১০.

বীণা আন্টি গেসল করতে গেছে। আমি বিছানার হেলানকাঠে পিঠ রেখে আধশোয়া হয়ে বসে আছি। তার গোসল শেষে আমি গোসল করতে ঢুকব। ফিরে এসে বীণা আন্টি আয়নার সমানে দাঁড়িয়ে হয়তো আমার মতো আগাপাশতলা হাজারো কথা ভাববেন– আমি তার সেক্সলজির কোন নতুন কোনো তত্ত্বের জোগান দাতা হয়ে উঠেছি। এতবছর পরও কেন একজন পুরুষ তার চেয়ে দ্বিগুণ বয়সি নারীর প্রতি আকাঙ্ক্ষাবোধ করে কেন? তার আচ্ছন্নতা কেন কাটে না? এই আচ্ছন্নতার মূলে আসলে কী কাজ করে? কেবলই জৈবিক চাহিদা নাকি, অন্য আরেকটি দিক আছে যে তৃপ্তি, যে কল্পনার পরিপুষ্টি, সে এখানে ছাড়া আর কোনো খানে কোনোভাবে এই স্বাদ পায় না, যে স্বাদ সে কখনো ভুলতে পারে না, যে স্বাদ সে ফিরে ফিরে চায়? বীণা আন্টি বলত, 'ফ্যান্টাসিতে ভুগো না। কারণ ফ্যান্টাসির সেই মেয়েকে তুমি কোনো দিনই পাবে না। আর এই জন্যই পর্নো ছবি দেখে যাদের কোনো ক্ষতি হয়, তা একারণেই হয়, ওই ধরনের মেয়েদের তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না।' আমি তাকে টোরার কথা বলতে পারিনি। টোরকে বলেছিলাম কি বীণা আন্টির কথা? মনে নেই। তবে বুঝি, যার থেকে সে ওই তৃপ্তি পায় সে কুরূপা নাকি অপরূপা তা সে কখনো ভেবে দেখে না। জগতের সমস্ত সুন্দরী দেহবতী যৌনাবেদনময়ীকে সরিয়ে তার ওই নারীটিকেই চাই। নারীরও তো বোধ হয় একই ঘটে। ওই পুরুষটিকেই তার চাই। কিন্তু বিয়ে হলে সেই নারী সঙ্গে সে কী একইভাবে এই স্বাদ পাবে? সহজ লভ্য নয় বলেই তার মনের ভেতরে এই টান বজায় আছে। দুর্লভ সুভল হয়ে গেলেই তার প্রতি আগ্রহ কমে যায়?

বীণা আন্টি কি চান নিজেকে অনেকের কাছ এমন দুর্লভ করে রাখতে। যার জন্য তিনি বিয়ের করলেন না, কারো সঙ্গে লিভ টুগেদার পর্যন্ত করলেন না। কিন্তু ঠিকই তার পুরুষসঙ্গের কোনো অভাব হল না। ভালোবাসার কোনো অভাব হল না। নিজেই বলেছেন, প্রতি তিন বছর পর পর তার সঙ্গগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলে যায়। আর সবসময়ই তিনি কমপক্ষে তিনজনের সঙ্গ পান। কোনো কোনো দিন

এমনও হয়েছে যে তারা একদিনের বিভিন্ন সময়ের তার কাছে এসেছে। আমি অবশ্য এসব চোখে দেখি নি। তার কাছে শুনি আমি এমন গল্প এমন অনেক মেয়ের কাছেই শুনেছি। প্রায় ক্ষেত্রে মনে হয়েছে নিজেদের মূল্যবান কেউ বা তাকে অনেককে চায় এমন একটা ভাবমূর্তি দাঁড় করাতেই তারা এই ধরনের গল্প বলে।

আমিও তাদের গল্প শুনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হতাম কিন্তু এখন মনে হয় কী বোকা আমি ছিলাম। আমি এখনো যে খুব একটা বুদ্ধিমান হয়েছি এমনটা মনে করি না। বরং নিজেকে আমার বেশ বোকা লোক বলেই মনে হয়। আর আমার বোকামির তো আসলেই কোনো শেষ নেই। কিন্তু আমি এও দেখেছি ভেতরের কিছু দুঃখকষ্ট ছাড়া আমার জীবন বেশ মসৃণভাবেই গড়িয়ে যাচ্ছে। কোথাও খুব একটা ধাক্কা খেয়েছি এমনটা বলা যাবে। তবে হ্যা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবাক হয়েছি, বিস্মিত হয়ে ভেবেছি : এমন করতে পারল লোকটা, এমনও ঘটতে পারে! কিন্তু এক কি দুদিনের ভেতর সেই বিস্ময়ও কেটে গেছে। এমন করে কেটে গেছে এতটা সময়।

মনখারাপ করার মতো যা কিছু ঘটে নিজেই এক সময় বুঝতে পারলাম যে, কোনো মন খারাপ করার মতো ঘটনাকে একদিনের ভেতর মন থেকে সরিয়ে দিতে পারার মতো ক্ষমতা আমি অর্জন করে ফেলেছি। আমি এই কথাটা অনেককে বলতাম যে, একদিনে ভেতরে যে কোনো মন অসাড় করে দেওয়া পরিস্থিতি থেকে নিজেকে আমি বের করে আনতে পারি তুলে আনতে পারি।

আমি আসলে কেন এটা পারি? কারণ আমি, সব সময় আগের দিনটাকে আগের দিন আর নতুন কোনো দিনকে একেবারেই নতুন দিন ভেবে নিতে পারি। এমনি কি ভেবে নিতে পারি আমি আগের দিনের যে আমি সেই আমিটা আর নেই। আগের দিনের আমিটা মরে না গেলেও, নতুন দিনের আমি সত্যিই নতুনভাবে জন্মেছি। তাই হয়তো আমি এসব পেরিয়ে আসতে পারি। মাঝে মাঝেই ভেবে অবাক লাগে নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় একটা ছেলে একবারে বিস্ময়কর একটা জগতে ঢুকে পড়েছে। তারপর প্রাণ পণে সেটাকে ভুলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনোদিনই সে তা ভুলতে পারেনি। সেই অসহ্য সুখের কয়েকটা রাত আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে আমি জানি। আমি অবশ্য অনেকটা ইচ্ছা করে আজো সেগুলি ধরে রেখেছি। কখনো কখনো মনে হয়, হুবহু বীণা অন্টির মতো কাউকে পেলে হয়তো সেগুলিকে সহজেই সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনো মানুষ কি কোনো মানুষের বিকল্প হতে পারে? আবার কারো জন্যই কারো জায়গা খালি থাকে না। কেউ অনিবার্য নয়, আবার কোনো কোনো শূন্যস্থান ভরে উঠলেও আসলে কি তা ভরে ওঠে? যেপাত্রে চাল সরিয়ে ডাল রাখা হল তাতে জায়গা হয়তো ভরল, কিন্তু চালের জায়গায় ডাল বসল। বদলগুলি এভাবেই হয় আর কি। এছাড়া আর কী বা করা যেতে পারে। এই স্বাদটা প্রেম বা বিয়ের সময়ও এক ধরনে থাকে? নাকি মেয়েগুলিরই স্থান বদল হয়, তার অনুভূতি বা নির্গমনের একটা পথ বা পাত্র চাই সেটা কে বা কী তাতে তার কিছু যায় আসে না। নিজেই তখন নিজের একমাত্র অবলম্বন। বাকি সবকিছু নিজের পরিতৃপ্তি বিধানের মাধ্যম ছাড়া আর কিছু নয়। আমি অবশ্য কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি নি– মাঝখানে বারকয়েক মনে হয়েছে কেবল এই ব্যাপারেই আমি মোটামুটি নিশ্চিত। কিন্তু পরে দেখেছি, তাতেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বীণা অন্টি তো বলেই, 'তিনটা ব্যাপার দেখ, একজন বলবে: যে বিশ্বাসে সন্দেহ নেই সেই বিশ্বাস মৃত, আরেক জন্য বলবে: একটা ধারণা ততক্ষণ পর্যন্তইই সত্য যতক্ষণ কেউ সেটাতে বিশ্বস বজায় রাখল, যেমাত্র তা থেকে বিশ্বাস তুলে নিল ওমনি সেটা মৃত ও বাতিল হয়ে গেল, আবার কেউ বলবে: প্রত্যেকে যেটাকে তার সত্য বলে বিশ্বাস করে তাও ঠিক, ততটাই সত্য যতটা অন্য কেউ ওর বিপরীত কোনো একটাকে নিজের সত্য বলে বিশ্বাস করে।'

বীণা আন্টি বলত, 'আমি যখন সেক্সজলজির জগতে ঢুকে পড়ি তখন দেখলাম এক বিরাট যজ্ঞ। একা আমার পক্ষে এর কিছুই করা সম্ভব নয়, কী নেই এখনে রাজনীতি, অর্থনীতি, শ্রেণীগত অবস্থান, শিল্প-

সংস্কৃতির প্রতিটি মাধ্যম– কোনটা নেই? কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক সিনেমা গান থিয়েটার ভাস্কর্য স্থাপত্যকলা কী নেই– আমি তো কোনো কিছুকে বাদ দিয়ে সেক্সলজিকে ধরতে পারি না। ফুকো যে প্রকল্পটা হাতে নিয়েছিলেন এটা একবারে অসাধ্য সাধনের চেষ্টা আর তিনি আসলে তার পারেনও নি। আসলে এটা সম্ভবও নয়। ভাষা আর যৌনতা বা ভদ্রভাবে বললে যাবতীয় জৈবিক চাহিদার সার হল যৌনতা, এক্ষেত্রে তুমি যেভাবে নিজেকে তুলে ধর, তা-ই তোমার অন্য সব আচরণকে দেখিয়ে দেয়, তুমি যখন রতিতে রত হও, তুমি তোমার জীবনের সব আচরণের সিম্বল হয়ে ওঠ। কিন্তু সেটা কত দিনের জন্য– যৌনতা তো একটা কর্ম তার জন্য কাউকে সমর্থ হতে হয়। একজন একশো বছরে বুড়ো বা বুড়ির কি সেই তাড়না থাকে? গ্রাম্য প্রবাদে কিন্তু বলে, পুরুষ মানুষ থেকে সাবধান, মেয়েমানুষ দেখলে মরার সময়ও এগুলির জিহ্বা দিয়ে লালা পড়ে। মরার আগ পর্যন্ত পুরুষের আশ মেটে না। পুরুষ মানুষ/ পাকনা বাঁশ/ মরার আগে মেটে না আশ। এমন একটা ছড়াও শুনেছিলাম।'

বীণা আন্টি বলত, 'আর আছে প্রবাদ প্রবচণের জগত তুমি দেখবা, পরে জ্ঞানবিজ্ঞান কেবল এর ভেতরে বৈজ্ঞানিকসত্যগুলিকে আবিষ্কার করেছে মাত্র। বাদ পড়ে গেছে কুসংস্কারগুলি। কিন্তু তুমি কি জানো অ্যান্থ্রোপলজিতে কুসংস্কার বলে কোনো কথা নেই। সেগুলিও কিন্তু মানব আচরণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ব্যাখ্যা করে– এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাও কোনো অংশে ছোটখাট বিষয় নয়।'

১১.

বীণা আন্টি আম্মার কাছে খুটিনাটি জেনে নিয়েছিলেন গুলশান খান সম্পর্কে। তার চেহারা সুরত থেকে সুরত কর্মের বিস্তরিত– কোনো কিছুই বাদ যায় নি, এমনকি পুরুষাঙ্গের মাপ পর্যন্ত। জীবনের শুরুতে যে কজন প্রযোজক-পরিচালক আর তাকে যারা চাইত তাদের সঙ্গে শুয়েছেন তাদের ভেতরে সেরা প্রেমিকই হল সুবক্তগিন, তবে সবচেয়ে রতিদক্ষ গুলশান খান। আর সবচেয়ে দীর্ঘ পুরুষাঙ্গের অধিকারী হাদিদ। তবে গুলশান খানের কোনো তুলনা নেই। আর সে অনুযায়ী আমি বলে হুবহু গুলশান খান। অবিকল নকল। একাবরে ডুপ্লিকেট কপি। আম্মা গুলশানের একটামাত্র ছবি রেখেছিলেন। বীণা আন্টিকে দেখিয়েছিলেন। আর সে ছবি দেখার জন্যই আমাকে প্রথম দেখেই বীণা আন্টিরও তা-ই মনে হয়েছিল। আম্মাও স্বীকার করেছে আমি ঠিক তার মতোই দেখতে। যুদ্ধের পর পর মামার সঙ্গে দেখা হওয়ার কয়েকদিন পর বীণা আন্টির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আম্মার। আম্মা তখন যে কোনোভাবে ঢাকা থেকে পালাতে চাইছিলেন। বীণা অন্টি আম্মাকে নিজের কাছে রেখে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আম্মা জিদ ধরলেন, তিনি মামার সঙ্গেই চলে যাবেন। তারপর রাজশাহী। তারপর দিনাজপুর তারপর আবার মাদারিপুর।

বীণা আন্টি বলত, 'কোহিনূর কিন্তু ব্যাসিকালি প্রচণ্ড সেন্সুয়াস। ইলিয়াস হোসেন কীভাবে তাকে বিয়ে না করে এতটা বছর কাটিয়ে দিল– আমার ভাবলেই অবাক লাগে। তবে হাদিদকে পেয়ে ঠিক যা কোহিনূরের দরকার ছিল তাই সে পেয়েছে। তোমার নিশ্চিয় ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি?'

আমি কিছু বলিনি। এসব কথা বলা যায় না। আমি মাকে মাঝে মাঝে খেয়াল করতাম। কখনো ব্রা পরা অবস্থায় বা খালি গায়েও তাকে দেখেছি। পরনে কেবল সায়া ছিল। ঠিক গোসল করা আগে বা পরে দু একদিন। আমি কেমন একটা টান বোধ করেছিলাম পরে নিজের কাছে নিজেই মরমে মরে গেছিলাম। আমি এও দেখেছি আম্মাও আমার দিকে মাঝে মাঝে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যখন আমি খালি গায়ে বা কাপড় বদলাচ্ছি।

পরে আমি কতদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে বলেছি, 'হাউ আর ইউ নাউ মিস্টার গুলশান খান– ইউ বাস্টার্ড।'

আম্মাদের বাড়ি আসামে, গুলশান খান পাকিস্তানি আর আমি? আমি কী? আমি তো বাংলাদেশের, আমি জানি লোকে জানে। আমার ভেতরে অনেক খটকা– আমি আসলে কী? কেমন লোক আমি? আমাকে কী মানায় আর কী মানায় না? এই প্রশ্নটার সমাধান হতো না টোরার সঙ্গে না মিশলে। আমি কার ছেলে, নাম কী ধাম কী এসব আমার আসল পরিচয় নয়। আমি কী পারি? আর আমি লোকজনের সঙ্গে কীভাবে লেনদেন করি এটাই আমার আসল পরিচয়।

এটা অবশ্য একটা সময়ের ধারণা– এটা যে বদলে যাবে– সে সর্ম্পকেও আমি মোটামুটি নিশ্চিত। আমি একটা সময় যেটাকে ভেবেছি এটাই সত্য, কিছুদিন পরে দেখি এর চেয়ে বড় ফাঁকি আর হয় না। আর সেই সত্যর ওপর ভিত্তি করে আমি যা কিছু ভেবেছি করেছি সবই তখন আমার কাছে বিরাট একটা ভাওতাবাজি মনে হয়েছে। নিজেই নিজেকে এভাবে ঠকিয়েছি। তাহলে সত্যটা কি বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে, বিশ্বাসটা সরে গেলেই সত্যের ফাঁসি? কিন্তু বিশ্বাস তৈরি হয় কীভাবে? যুক্তিতে? আমি জানি না। বীণা আন্টিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শুনে বললেন, এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাকে লাগবে। 'আমার কাছে এসব জেনে কী করবি। তার চেয়ে তোকে আমি অ্যানালসেক্স সম্পর্ক বলেতে পারি।' একটু ক্ষেপে উঠলে আমাকে তার ওই তুইতুকারি করাটা একেবারে শুরু থেকে দেখেছি।

আমি হাসলাম।

বীণা আন্টি সত্যি কোনখান থেকে কোনখানে চলে আসতে পারে– এটা আমাকে প্রায়ই অবাক করে।

'না, আমি এসব শুনতে চাই না।'

'কেন প্রাকটিকাল হয়ে গেছে বলে?'

'না। না জেনে কাজ করলেও কাজটা হয়।'

'ধর, বাড়ি কীভাবে বানাতে হয় তার জন্য আগে আর্কিটেকচার পড়ে তারপর মানুষ বাড়ি করতে শুরু করেনি। আর্কিটেকচার পড়ার ব্যাপার অনেক পরে তৈরি হয়েছে।'

মানুষ অনেক কিছু জানার আগেই করতে পারে। সারা শরীরে নেওয়া তার স্পর্শের আগুন কোথাও কিছু একটাকে নিভিয়ে দিতে আমাকে আকুল করে তুলেছিল। আমার বুকে মুখ ঘষা থেকে শুরু। তারপর একটা পর একটা ধাপ মেনে মেনে এগুনো। আমি তো এসবের কিছুই জানতাম না। আমি তাকে বলতেই পারি, 'আমি তো বুঝতেই পারিনি আমি প্রথম কোন পথে যাচ্ছিলাম।' এবং আমি নিজেকে প্রথম প্রবিষ্ট করেছি যাকে পরে জেনেছি গোল দরজার ভেতর দিয়ে। আমি চোখ খুলে এবার মাত্র দেখতে পেয়েছিলাম আমার কোমরের একটু নিচে আসন পিড়ি করে বসে নিজের শরীরটায় একটু একটু করে আমাকে ভরে মিশিয়ে নিচ্ছেন। একটা ধারালো ছোরা একটু একটু করে ঢোকানোর মতো করে পুরুষাঙ্গটা ধরে তিনি তার ভেতরে নিয়ে নিচ্ছেন। সেটা আসলে কোন জায়গা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমি তো জানিই নি কোন দিক দিয়ে তখন প্রবেশ করতে হয়। তারপর আমি সমুদ্র আর তিনি আমার ওপরে ঝড়ে পড়া জাহাজ। পরে বলেছিলেন, 'বোট-লেডি চেন? আমি হলাম সেই বোট-লেডি এঘাট থেকে ওঘাটে কত পুরুষকে যে পার করে দিয়েছি তার কোনো হিসাব নেই।' তার এসব কথা বিশ্বাস হত না। সেই ঝড়ো হওয়ার ভেতরে ছুটে চলার সময়টাকে পরে দৃশ্য থেকে দৃশ্যে ভাগ করে দেখিয়েছিলেন কীভাবে পার হয়ে যেতে হয়। কত রকম দৃশ্যই না দেখেছিলাম। আমি চিৎ হয়ে শুয়ে। আমার একটা পা তার কাঁধে। অন্য পা মেলে রাখা। তিনি এ অবস্থায় নিজেকে প্রবেশ করিয়ে কোমর হাকাচ্ছেন। কখনো মেলে রাখা পাটা কাঁধে তুলে অন্য পাটা নামিয়ে দিয়েছেন। এক সময় দুটো পাই নামিয়ে পুরো শরীরটা আমার ওপর নিয়ে এসেছেন। তার পাহাড়পর্বতের নিচে আমি ক্রমাগত দলিত মথিত হতে থাকি। প্রবল ভূমিকম্পে বিশাল প্রাসাদের দুলতে থাকা ঝাড়বাতির মতো বারবার আমার চোয়াল থেকে কপাল ছুঁয়ে আবার কপাল থেকে চোয়াল পর্যন্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে দুলতে থাকে তার বিশাল বিশাল দুটো স্তন। তিনি হিং হিং শব্দ করতে লাগলেন। মুখের ওপর ঘষটাতে থাকা স্তন দুটো আমি দুহাতের থাবায় আঁকড়ে ধরলে এর পুরোটাই উপচে বের হয়ে

যায়। কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে একসময় নিথর হয়ে পড়ে থাকেন আমার ওপর। বেশ কিছুক্ষণ পর আমাকে গভীর আবেগে আদর করতে থাকেন। তারপর আবার একবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে লাশের মতোই পড়ে থাকেন। তারপর আবার তিনি বাত্যাময়ী। এভাবে ঘণ্টার ঘণ্টা বিশ্রাম আর বাত্যায় কেটে যেতে থাকে। তার গতি ক্রমে ধীর থেকে দ্রুত থেকে দ্রুততর, দ্রুততর থেকে দ্রুততম হয় আর একই ভাবে ধীর থেকে আরো ধীর হয়ে এক সময় স্থির হয়ে যায়। আবার তিনি নিথর হয়ে পড়ে থাকেন। তিনি বলেছিলেন, আমাকে পৃথিবীর দীর্ঘতম মিলনের স্বাদ এনে দিবেন যাতে বছরের পর বছর আমার সেই তৃপ্তি নিয়েই কেটে যেতে পারে। এমনকি কেটে যেতে পারে সারাজীবনও। মিলনের বরতা/ দ্রুততা নয়/ ধীরতা। কে জানত এসব। তার নিজেরওতো এসব জানতে কতটা বছর পার করতে হয়েছে। আমিতো বুঝতে পারিনি এর কিছুই প্রথমে। প্রথমবার তিনিই আমাকে তার ওপর নিয়ে এলে আমি কয়েক মুহূর্তের ভেতর পোস্টঅফিসের শিলমোহর হয়ে উঠি। ভেবেছিলাম প্রতিটি সঞ্চালনে তার ভেতরে দুর্বোধ্য শব্দে ভরা হাজারো বার্তা পৌঁছে যাবে। তার কোনো আকুতি আমি শুনিনি। দেখেছিলাম তার বগলের নিচ থেকে ওপর দিকে ফুলে ওঠা দুটো থ-এর মতো মাংসল থলি ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে একই তালে নাচছে। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ওই নাচ দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা গরগরে হিংস্রতা আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমি এত জোরে আসাযাওয়া করতে শুরু করেছিলাম যাতে তার ওই দুপাশ দিয়ে চক্রকারে নাচতে থাকা থালি দুটো ছিন্নভিন্ন হয়ে ফেটে যায়। পরে তিনি বলেছিলেন, ওভাবে হিংস্র হয়ে উঠে কোনো কিছু কারো কাছে পৌঁছানো যায় না। কোথাও পৌঁছানো যায় না। কি সঙ্গমে কি জীবনে এই নিয়ম মনে রেখ। এবং দেখিদিয়েছিলেন কী করে সারাদিন দুই পর্বতের মাঝখানে সঙ্গমের সমতলে পড়ে থাকা যায়। কখনো চূড়ায় উঠতে নেই। জীবনে সবখানে চূড়ায় যদি যেতে চাও তো এসময়টায় উপত্যকায় থাকো। নিজেকে নতুন শক্তিতে ভরিয়ে তুলতে পারবে। জীবনে মুহুর্মুহু এর দরকার হবে না। জীবনকে অন্যকাজে লাগাতে পারবে। সত্যিই তা-ই। তারপর কতবছর পর টোরা প্যাট্রিক। ও তো এসব জেনে ওস্তাদ হয়নি। নিজেকে একেবারে উজাড় করে দিয়েছিল টোরা। আর যেভাবে ওর সঙ্গে আমি জড়িয়ে যাওয়ার ঘটনাটা আমাকে সেই ছোটবেলার মারামারিটাকে মনে করায়। আর মনে করায় ইয়াবারার কথা। মনে পড়ে নিশিপর্ণার কথাও। বুয়েটে পড়ার সময় কারাতে দোতে যেতাম। শিখে নেওয়া কাতাগুলো সবসময় অনুশীলন করেছি। অদৃশ্য এক প্রতিপক্ষের সঙ্গে নিত্য যুদ্ধ আমি কোনোদিনও ছাড়তে পারিনি। পারিনি বলেই সেদিন টোরাকে রক্ষা করা গিয়েছিল।

কয়েকদিনের জন্য ছুটি কাটাতে ফ্রান্সে গিয়েছিলাম। প্যারিসের ওই এলাকাটা একটু ঘিঞ্জিমতো। বার, গেক্লাব আর ব্রোথেলে ভরা। একদিন অনেক রাতে একটা আণ্ডারপাসে নেমেছি। অন্যদিকে দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় চাপা একটা গোঙানির শব্দ শুনে থামি। দেখি যেখান দিয়ে নেমেছি তার সিঁড়ির তলার আবছা অন্ধকারে তিনটা ছায়া ধস্তাধস্তি করছে। আমি এগিয়ে যেতে একটা ছায়া আলোয় চলে এল। টাক মাথা একটা লোক। হাতে সাপের ফনার মতো একটা ছুরি। লম্বায় আমার চেয়ে বেশ খাটো। লোকটা ভুল করেছিল তার সঙ্গীর কাছে ছুরিটা নিয়ে আমাকে সামাল দেওয়া চিন্তা করতে গিয়ে। তা না করে যদি ছুরি দিয়ে মেয়েটাকে জিম্মি করত তাহলে হয়তো অন্য কিছু ঘটাতে পারত। কিন্তু কেন তা পারেনি তা বুঝতেও বেশি সময় লাগেনি। সিঁড়ির তলায় ওই লোকটা উপুড় হয়ে থাকা মেয়েটাকে তার খুলে রাখা প্যান্ট দিয়ে বেঁধে রেখে উঠে এসেছিল। এই লোকটার সারা শরীরে কিলবিল করছিল পেশি। গায়ের রঙ কাগজের মতো সাদা। আমাকে ভয় পাওয়ানোর জন্যই যেন সে তার জামা খুলে ফেলেছিল। শরীর দেখাচ্ছিল। অন্য দিকে টোরা বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল মেঝেতে। লোকটার নেতানো লিঙ্গ আর অন্ডকোষে রক্ত লেগে আছে। আমি বুঝলাম যা বোঝার। জামা খুলে নেওয়ায় আন্ডারওয়ার পরা লোকটাকে একটা বেঁটে দৈত্যমতো মনে হচ্ছিল। আগের জনের ডান পাটা ভেঙে দিয়েছিলাম। একটা হাতও মচকে গেছে। কোনো মতে ল্যাংচাতে ল্যাংচাকে পালানোর সময় ঘাড়ের ওপর একটা রদ্দা মারতেই মুখ থুবড়ে পড়ে যায়

সে। কিন্তু এর ভেতর ছোরাটা কোথায় পড়ে গিয়েছিল খেয়াল করি নি। ওকে যখন মারছি তখন মেয়েটা 'লুক আউট' বলে প্রচণ্ড চিৎকার করে ওঠে। আমি পেছনে তাকাতেই অন্যলোকটা আমার ওপর ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু আমি একপাশে সরে গিয়ে লোকটাকে ল্যাংমেরে ফেলে দেই। তখন ওর ছোরার ধরা হাতটা পড়ে থাকা লোকটার কোমারে গিয়ে সেখানেই গেঁথে যায়। আমি তখন ঝেড়ে একটা লাথি মারি। লাথিটা সে কাটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর একটানে জামাখুলে আমাকে কীসব বলে আমি বুঝতে পারি না। আমি সর্তক চোখে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ অন্যদিকে তাকিয়ে একটা কিছু দেখার ইঙ্গিত করি যেন কেউ আসছে। লোকটা সেদিকে সামান্য ঘাড় ফেরাতেই আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ওর জঙ্গার সামনে হাড়ে লাথি মারি। সে একটা মারেই কাত হয়ে যায়। তারপর লোকটা অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত এর নাকে মুখে পেটে মেরে যেতে থাকি। এভাবে একটা বাহাদুরি দেখিয়ে টোরার সঙ্গে আমার পরিচয়। ওকে আমি সাবওয়ে দিয়ে ওকে কোলে তুলে বের করতে না করতেই পুলিশ আসে।
হাসপাতালে বেডে শুয়ে টোরা বলেছিল,'একেবারে ছবির মতো তাই না?'
আমি বলি,'মে বি।'
'বাদবাকি টুকুও যদি ছবির মতো হয় কেমন হবে?'
'তুমি কী বলতে চাইছ ঠিক বুঝতে পারছি না।'
'তাহলে তো তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'
খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। জীবনের আরো কত না ফ্যান্টাসি তখন বাকি রয়ে গিয়েছিল টোরা না এলে জানাই হত না। ওর এর সবই স্বাভাবিকভাবে শেখা। যেভাবে মানুষ খেতে শেখে হাঁটতে শেখে অনেকটা সেভাবেই। সে আবার নিজেকে বলতে, শ্যামিশ জ্যু। অনেকটাই থাই মেয়েদের মতো দেখতে।
আমাকে বলেছিল, তুমি জানো না মুসলিম হিসেবে যে কেউ খৃস্টান আর ইহুদিকে বিয়ে করতে পারে। আমি বলেছিলাম, আমি তো বিয়েই করব না। অন্তত এখন পর্যন্ত তা-ই ঠিক করা আছে। পরে বদলাতে পারে কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত জানি, দিজ ওয়ার্ডস আর সিম্পলি মিনিংলেস টু মি।
আরিয়ান তো বলেছিল, আমি যা চাই তাই হবে, কিন্তু সে আমার সঙ্গে থাকবে। আমার সন্তানের মা হবে। আমি সেও মানতে পারিনি। আমি বলি, আমি কোনো সন্তান চাই না। আরিয়ানার সঙ্গে এই সন্তান নিয়ে আমার টানাপোড়েনের শুরু। অনেকদিনপর সেদিন লন্ডনের রাস্তায় আরিয়ানার সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো আর কখনো ওর সঙ্গে দেখাই হত না।
আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, 'আলো, এই আলো, আলোওওও'– প্রথমবারেই আমি শুনতে পেয়েছিলাম। দ্বিতীয়বারে থেমে গিয়েছিলাম আর তৃতীয়বারে পেছন ফিরতেই দেখি আরিয়ানা। দেখি আরিয়ানই আমাকে আমার সেই প্রাচীন নামে আলো আলো করে ডাকছে। অন্যদের কথা জানি না, বিশেষ করে ও আলো বললেই আমি শুনতাম 'অন্ধকার, অন্ধকার'। ওটা বীণা আন্টির দেওয়া অকালবোধনের ফলাফল নয়, যখন থেকে ব্যাকরণে বিপরীত শব্দগুলি একটু একটু জানতে থাকি, তখন থেকেই।

১২.

'আলো, এই আলোওওওওওওওওওওওওওও।' ওর দৌড়ের শেষ পা-টা থামল আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে তার ফুট দুয়েক দূরে। আমি আরিয়ানাকে দেখছিলাম। আরিয়ানা আমাকে। এ সময়ে ঠিক কী বলা যায়। মুখে আসছিল না।
'কেমন আছো, বা তুমি! এইখানে!'
বা বিস্ময়ে অবাক হয়ে ওঠার শব্দ নিয়ে কোনো চিৎকার– কোনোটাই আমি এখন পারি না।
আরিয়ানা বলেছিল, 'আমি চাইলেও ওর কাছ থেকে পালাতে পারব না। আর ও আমাকে খুঁজতে না চাইলেও আমার সঙ্গে ওর দেখা হবে।' কথাটা মনে হতেই বলি, 'তুমিই জিতে গেলে।'

আরিয়ানা আমার শান্ত স্বরের চেয়ে আরো শান্ত গলায় বলে, যদিও তখনও সে কিছু হাঁপাচ্ছিল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'যারা জেতে তারা হারব না– এই রকম চিন্তা করেই বলেই জেতে।'
'দেখা হল, হতে না হতেই ভাবের কথা।'
আমি হাসি। ও-ও হাসে।
আগে আরিয়ানাই বলত, 'আপনি এত ভাবের কথা বলেন কেন? এত হাসি পায়।'
আমি হয়তো ঠোঁটের কোণে একটু হাসলাম। ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওকে দেখতে লাগলাম। আর ও-ও আমার ঠিক মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমার এখন কী করা উচিত, এক পা এগিয়ে গিয়ে ওকে জাড়িয়ে ধরা উচিত। নাকি স্বাভাবিক কণ্ঠে যেমন বলি, 'চল কোথাও বসি। চল।' তারপর জিজ্ঞসা করব, 'কফি?'
প্রথমে আমি আসলে ঠিক করতে পারছিলাম না কী করব বা বলব ওকে। কদিন একা একা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একবারও মনে হয়নি আমি চাকির ছেড়ে দিয়েছি। কী করে চলব। বরং মরে হয়েছে, ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আমার কোনো কাজ নেই। ঠিক এই সময় আরিয়ানার সঙ্গে দেখা হওয়াটাতে কি ভালো হল?
কদিন আগে চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভাবছিলাম কিছুদিন দেশ থেকে ঘুরে আসি। অনেক তো হল। হাতে মোটামুটি টাকাও জমেছে। গতকাল আবার টোরা প্যাট্রিক বলল, সে আর সানফ্রানসিস্কোকে ফিরবে না। অ্যাডাল্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আর কোনো কাজ করবে না। আর কোনো বাজে কিছুতে জড়াবে না। কিন্তু আমি টোরার ব্যাপারে ক্লান্ত। মারিয়া গিলক্রিস্টের কথাই ঠিক। আমার কোনোভাবেই টোরাকে এভাবে নেওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু আমার বরাবর যা হয় প্রথমেই কাউকে ভালো মন্দ দিয়ে বিচার করি না। মন্দ হলে মনের ভেতরে একটা খটকা অল্প কিছক্ষণের ভেতরেই এসে ভিড় করে, কিন্তু দেখা হল আর এড়িয়ে চললাম– এমনটা আমি পারি না। তাছাড়া টোরাকে তো খারাপ লাগার কোনো কারণ নেই। এমন প্রাণবন্ত উদ্দীপ্ত মেয়ে খুব একটা দেখা যায় না। আর ভেতরের কথা তো নাই বললাম। টোরা আমাকে যা দিয়েছে তা কেউ সহজে পায় না। আমি আসলে কী চাই টোরাই ঠিকমতো ধরে ফেলেছিল। বীণার মতো আমি তার কাছে কোনো পরীক্ষানিরীক্ষার বস্তু ছিলাম না। ও বলত, 'তোমরা মুসলিমরা হল মর্ডারেট জু। তোমাদের রক্ষণশীলতা আছে বাট তোমাদের ধর্মে প্রবেশের সুযোগও আছে।'
টোরাকে শুরু থেকেই খুব র‍্যাশনাল মেয়েও মনে হয়েছিল। কিন্তু ওর মন্ত্র: নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার।
আমি বলতাম, প্রত্যেকেই নিজের কাজের জন্য যুক্তি তৈরি করে নেয়। সাধু বল কি শয়তান। প্রত্যেকে নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য কিছু যুক্তি ঠিক করে রাখে যে কেন সে এটা করছে বা ওটা করছে।
ও বলে, 'কিন্তু মাই ডিয়ার, আধুনিক যুগে আলাদা করে শয়তান আর সাধু নেই। সবাই কমবেশি সাধু সবাই কমবেশি শয়তান। আর শয়তানের ভেতরেও সাধু, সাধুর ভেতরে শয়তান। তুমি নিজেকে কী মনে কর?'
'আমি যে কী– এটাই আমিই মনে করতে পারি না। আমি হলাম চলতি হওয়ার পন্থী। কিন্তু তাও যে না আমি জানি। আবার একবারেই যে না– তাও কিন্তু না।'
মাঝখানে রাগারাগি করে চলে গেল সানফ্রানসিস্কোতে। আমিও ওর যাওয়া নিয়ে কোনো রকম সাধাসাধি করিনি। তাছাড়া এই কাজটা আমি একবারেই পারি না। আমি কীভাবে কীভাবে অনেকগুলি কাজ পারতাম না। যেটাকে লোকে সামাজিকতা বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে করতে পারে। বরং আমি ওর ইমেইল নম্বরটা মুছে ফেলেছি। মোবাইল ফোনে কেবল লিখেছিলাম, প্লিজ ডিলিট মাই নম্বার ফ্রম ইয়োর ফোনবুক। টোরা গতকাল বলেছে, 'তুমি যা করেছ এরপর কি কোনো মানুষ তোমার দিকে ফিরত। কী হিউমিলিয়েটিং!

ভাবতে পারো। এর চেয়ে আমাকে গুলি করলে আমি খুশি হতাম। তুমি লোকটা হাড়ে হারামজাদা। আস্ত একটা শয়তান।' এসব বলছিল– আর বারবার আমাকে জড়িয়ে ধরছিল। চুমু খাচ্ছিল।
আমি বলেছি, 'তুমি ফিরে যাও। আমিও ভাবছি দেশে ফিরে যাব।'
'কেন? আমি তো ফিরে এসছি।'
'তাতে কী?'
টোরা আমার পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর মাথাটা রেখে ওর গাল কপাল আমার গলা ঘাড়ের ঘষতে ঘষতে বলল, 'তুমি কাজটা ছেড়ে দিয়েছ।' আমি প্রথমে একটু চমকে উঠলেও সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি মারিয়া বা স্যামসনের কাছ থেকে ও ঠিক সব জেনে ফেলেছে। আমি আবার টের পাই টোরার জন্য আমার মেরুদণ্ড বেয়ে কি বুকের ভেতর থেকে কেমন একটা অনুভূতি ওঠা-নামা করছে। তারপরও আমি শান্ত থাকি। নিজেকে সামলে রাখি।

১৩.

টোরাকে অনেক অপমান করেছি। অন্তত ওর ফিরে যাওয়ার আগে। টোরা পূর্ব লন্ডনে গেছে ওর কোন এক প্রাক্তন কলিগের কাছে। আজকে রাতে আমাদের এক সঙ্গে ডিনার করার কথা, আর আজকে আমার চোখের সামনে আরিয়ানা। প্রথম দেখা হওয়ার সময় আমাদের বয়সের পার্থক্য দ্বিগুণ না হলেও পনেরো তো বটেই। কিন্তু আরিয়ানা তখন একেবারেই কোলের শিশু। আমি তাকে কোলেও নিয়েছি দু একবার। বীণা আন্টি তখন আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছেন। আমাকে নিয়ে গেছেন নতুন একটা পৃথিবীতে। আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি এরপর থেকে বিশেষ একটা ধরনের মেয়ে ছাড়া আর সব মেয়ে আমার কাছে কেমন একটা অনাগ্রহের বিষয়বস্তুতে পরিণত হবে। আমি নিজেকে খুব সামাল দিতে পারতাম। কেন পারতাম তা জানি না। আসলে সামাল দিতে পারাটা কেউ কেউ ভেতর থেকেই পারে। আমি জানি না আমার বাবা সুবোক্তগিন সম্পর্কে তার বলা কথাগুলি সত্য কিনা। আমি তখন কেবল নাইনে পড়ি। কিন্তু আমার বয়সি ছেলেমেয়েদের তুলনায় আমি একটু বেশি বয়স্ক ছিলাম ভেতরে ভেতরে। আর সে সময় হঠাৎ করে আমি লম্বা হতে শুরু করি। দেখেতে দেখতে প্রায় ছফুট হয়ে উঠি। ঠিক কী মনে করে আমাকে আম্মা বীণা আন্টির বাসায় নিয়ে এসেছিলেন আমি জানি না। আর আমাকে রেখেই বা কে চলে গেলেন। আমার অনেক পরে মনে হয়েছে এটা ছিল দুজনের ঠিক করে রাখা একটা ব্যাপার। আম্মা চাইতেন মেয়েদের ব্যাপারে আমি যেন নিজ থেকেই কোনো আগ্রহ না দেখাই। আমি আসলে তার আগেই একটা জগতে ঢুকে পড়েছিলাম। লেখাপড়ার জগতে। কিন্তু কেউ সেটা তেমন বুঝতে পারেনি বলেই আমার পরে মনে হয়েছে। টিনা অবশ্য বেশ চালাক মেয়ে। ও আমাকে তেমন একটা ঘাটাত না। তবে চাইত আমি একটা কিছু করে দেখাব। সব সময় আমাকে আমার প্রতি ওর একটা নীরব সায় ছিল। আমি টের পেতাম টিনা আমাকে পছন্দ করে। আর আমি যে তার কোনো বান্ধবীর সঙ্গে মিশি না এটাতে ও মনে মনে খুশি হয়। আমি জানতাম না টিনার বান্ধবীরা আমাকে চিড়িয়াখানায় জন্তু দেখার মতো আমাদের বাসায় আসত।
আরিয়ানা পরে যখন আমাকে প্রায়ই সময়, 'আলো, এই আলো,আলোওওও'– ডাকত নিজের নামটাকে একটা সময় মনে হত এটা আমার নাম না। আমার নাম কী করে আলো হয়? কিন্তু বাবার সঙ্গে মিলিয়ে আমার নাম রেখেছিলেন মা। বাবা মারা গিয়েছিলে যুদ্ধে কিনা সেটা রহস্যই রয়ে গেছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকা পর্যন্ত মা অপেক্ষা করেছিলেন। তারপর আমাকে একা করে দিয়ে মা চলে গেলেন।

আমি যদিও জানাতাম তিনি কোথায় গেছেন। টিনা সেময়টায় আমাকে বেশ সাহায্য করেছিল। কিন্তু তার একটু পরে আমি মায়াবতীর দেখা পেয়েছিলাম।
টিনা এরপর থেকে যখনই দেখা হলেই আর কিছু না হোক জিজ্ঞাস করবেই, 'মায়াবতীর খরব কি?' এবারও দেশে এসে ওর সঙ্গে দেখা হল এবং কিছুক্ষণ পরেই ওই প্রশ্নটাই করল।
আমি বলি, 'তোমরা কি ধারণা আমি মায়াবতীর জন্যই ফিরে এসেছি?'
'কে বলতে পারে? হু নোজ।'
'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'
'এই জন্যই তুমি আমার বন্ধু। আমার মনের কথাটা ধরতে পারো।'
'তা ঠিক, অন্যের এই ডিজায়ার, ইমপালস, অবশেসন যে কমপ্যাশনেটলি অনুভব অনুমান করতে পারে সেই তো বন্ধু। আচ্ছা মায়াবতীর কি ডিভোর্স হয়েছে?'
'না।'
'তাহলে সেই ম্যাদামরা ঢোঁড়াসাপ স্বামীর সঙ্গেই আছে?'
আমি চুপ করে থাকি। আমি মোবিনকে কেন জানি পছন্দ করতাম। কিন্তু কেন যেন মায়া হত ওর জন্য। ভাবতাম, মোবিন আসলেই কি মায়াকে এতটা বিশ্বাস করত। নাকি মায়া তার বাবামায়ের একমাত্র মেয়ে বলে তার সম্পত্তির লোভে তার সমস্ত ইচ্ছাকে মেনে নিত। কোনো কাজে কোনো বাধা দিত না? মোবিনের সঙ্গে আমার কখনো পরিচয় হয়নি। মায়ার কাছ থেকে অনেকগুলি ছবি আমি নিয়েছিলাম বিদেশে যাওয়ার আগে। মায়ার কাছে ওর গল্প শুনে, ওর ছবি দেখে মোবিনকে আমার ভালোই লেগেছিল। মায়া বলত মোবিন ওকে বিরাট একটা যন্ত্রণার ভেতরে ফেলে দিয়েছে। ও একটা আস্ত স্বার্থপর। তারা সারা জীবনটা শেষ করে দিয়েছে। বাপের সঙ্গে রাগ করে মায়া মোবিনকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসে। ঠিক করেছিল, ফ্যামিলির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না।
'তুমি জানো তো আমার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। তাও কখন আমরা যখন আমি আর আমার বোন ছায়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেলাম ঠিক তখন।' আমি মনে মনে বলি, এতো দেখি আমার মতোই কেস।
'কেমন দেখতে মহিলা?'
'সিম্পলি বিউটিফুল। বাট সি ইজ অ্যা ক্র্যাক।'
'মানসিক রোগী?'
'তা কি না জানি না।'
'তোমরা বাবা না কলেজের প্রিন্সিপাল।'
'হ্যা, আর ওই মহিলা?'
'উকিল।'
'সরকারি?'
'হ্যা।'
'কীভাবে হল সম্পর্কটা?'
'আমি জানি না।'
'বল না।'
'বললাম তো জানি না।'
'আচ্ছা থাকুক।'
আমি জানি মায়া নিজের থেকেই এসব বলতে থাকবে। আর তাই বলত। একদিন ধানমণ্ডি লেকের পাড়ে বসে মায়া বলেছিল, তার এই মা সম্পর্কে। 'খুব অদ্ভুত জানো। তোমাকে বলেছি মা ক্র্যাক, কিন্তু সেটা যেন হঠাৎ করে হত। আবার একবারে জলের মতো সহজ হয়ে যেত। ভীষণ ভালোবাসতো আমাদের

দুবোনকেই। বিয়ের আগেই মহিলা আমাদের বাসায় আসা যাওয়া করত। এমন কোনো দিন নেই যেদিন তিনি কোনো না কোনা জিনিস আমাদের দুজনের জন্য না আনতেন।'
'কেন আসত?'
'আমার বাবার দূর সম্পর্কের ফুপাত বোন না কী যেন হত। আমরা বাবা দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম। সে তুলনায় আমার এই মা অনেকটাই কালো। লোকে বলে শ্যামলা। কিন্তু এমন কাটা কাটা চোখ নাক মুখ। আর এত চুল। কেশবতী আর কি। আমার নানি বলত, যেমন তেমন নারী/ কেশেতে সুন্দরী।'
'তোমাদেরও চুলও তো বাহরি।'
'আমার মায়েরও ছিল।'
'কেশবতীদের আমার বাবা বেশ পছন্দ করেন। একদিন বাসায় তার এক বন্ধু এসেছেন। দুজনে মিলে আড্ডা হচ্ছে। বন্ধু বাবার কাছে জানতে চাইল, মেয়েদের কোনটি তোমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর। বাবা কোনো মাত্র চিন্তা না করে বললেন, চুল।'

১৪.

মায়াবতী আসলে তো ওর নাম না, ওর নাম শুধু মায়া। টিনা দুষ্টামি করে বলত, মায়াবতী। তবে আমার কাছেও মনে হত মায়ার আসলেই মায়া আছে। মায়ার সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটা খুব অদ্ভুত। তখন আমাদের বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা চলছে। আমাদের রুমে একটা ছেলে কদিন ছিল সে সময়। কাদিম নাম। অদ্ভুত নামের এক অদ্ভুত ছেলে। যতদিন ছিল আমাদের মাতিয়ে দিয়েছিল। কাদিমের সঙ্গে কীভাবে মায়ার পরিচয় তা আমি ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু কাদিম কথা কথায় মায়ার কথা বলত। ময়লার কোনো পিঠই ভালো না– রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে গেলে বলেছিল কাদিম। সময় আর জায়গা মতো কথাটা এত যুৎসই হয়েছিল যে আমরা হাসতে হাসতে মাত। ও এমন সব কথা বললে আমরা বলেছিলাম,
'এসব কোথায় পাও?'
'আমার এক বন্ধু আছে মায়া। দারুণ মেয়ে।'
'দেখতে কেমন?'
'দারুণ।'
'সুন্দরী?'
'ঠিক সুন্দরী বলব না, কিন্তু দারুণ এট্রাকটিভ।'
'মাঝে মাঝে আমি জিজ্ঞাস করতম, কী মায়ার সঙ্গে দেখাটেখা হয় না।'
'হয়।'
'একদিন নিয়ে আস না। দেখি।'
মায়ার এসেছিল সঙ্গে ওর আরো দুই বান্ধবী। কাদিম, আমি আর আমার রুমমেট রিকো হল থেকে বেরিয়েছি দেখে একটা রিক্সায় তিনটা মেয়ে। একটা মেয়ে ছিপছিপে শুকনা, শ্যামলা, এই মেয়েটা বসেছে সিটের ওপরের দিকে আর সিটে বসেছে এপাশে একটা গোলগাল ভীষণ ফর্সা মেয়ে, চেহারাটা মোঙ্গলিয়ান ধাঁচ আছে। কটা চুল । আর একপাশে কালো একটা মেয়েটা কোকড়ানো চুল। ধারালো চিবুক আর চোখে ততটাই তীব্র দৃষ্টি। মনে মনেই বলি, সি ইজ সো শার্প। এবং অনেকটা নিশ্চিত হয়ে বলে উঠি, 'দিস ইস মায়া!'
কাদিম আর ওরা তিনজন একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। ধুপধাপ করে রিক্সা থেকে নামল। নামার পর পরই কাদিম সবার পরিচয় করিয়ে দিল। জানা গেল সিটের ওপরে বসা মেয়েটির নাম জনি, মোঙ্গলিয়

চেহারার মেয়েটির নাম সারাহ আর কালো মেয়েটার নাম মায়া। এবং আমার অনুমান ঠিক। আমি রিক্সায় ওকে দেখেই কেমন জানি বোধ করেছিলাম। মেয়েটা সত্যিই চোখে পড়ার মতো।
রিকো বলল, 'ও! এই নাকি মায়া!'
রিকোর কথার ভেতরে কেমন একটা ঠাট্টা ছিল।
মায়া তীব্র ভ্রূকুটি করে বলল, 'এই নাকি মানে?'
আমি বলি, 'আসলে জানো কি ও এত শুনেছিল, তুমি দেখতে খুব অ্যাট্রাকটিভ, কাদিম তো সারাক্ষণই তোমার গল্প করে। কিন্তু এখন ও ঠিক মেলাতে পারছে না।'
'মানে?' মায়ার সে কি তীব্র ভ্রূকুটি। চোখমুখ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে,' কী মিলছে না?'
'মানে যতটা অ্যাট্রাক্টিভ ভেবেছিল তার সঙ্গে মিলছে না।'
শুনে তো মায়ার চোখ মুখ অন্ধকার। কালো মেয়ের মুখ অপমানে কেমন বেগুনি হয় সেই প্রথম দেখেছিলাম।
আমরা হলের গেস্টরুমে বসলাম। মায়া খেয়াল করছিলাম গটগট করে হাঁটছে। গেস্টরুমে সোফায় বসেও রাগে গজ গজ করছে। কাদিম আগের মতো কথা বলে যাচ্ছে । ওর গলার স্বার এমন যে শুনলেই হাসি পায়। জনি, সারাহ, রিকো আমি–সবাই হাসছিলাম , কিন্তু মায়া মুখটাকে কেন হাড়ি বানিয়ে রেখেছে এই নিয়েও একদফা হাসির হল্লা বয়ে গেল।
মায়া বলল সে চলে যাবে এক্ষুনি।
রিকো সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'সে কি তোমরা এখানে এসে না খেয়ে চলে যাবে। আমাদের ক্যান্টিনের বিখ্যাত রসগোল্লা আছে।'
জনি সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'হ্যা মায়া, ওনাদের রসগোল্লা ছুইল্লা খাইতে হয়। রসগোল্লা ছুইল্লা খাইতে খাইতে ওনাদের একটু ছুইল্লাটুইল্লা তারপর আমরা যামু। ততক্ষণে রিকোর দেওয়া ওয়াডারে তিনপ্লেট ভরা এটা সেটা চলে আসল। কলা বিস্কুট আর রসগোল্লা। জনি নিজের থেকেই একটা বিস্কুট আর কলা নিয়ে একবার বিস্কুটে কামড় আর একবার কলায় কামড় দিয়ে উমম উমম শব্দ করে খেতে লাগল।
সারাহ খাবে কি জনির দুষ্টামিতে হাসার ঠেলায় খেতেই পারছিল না। 'তুই থাম না একটু।' এদিকে মায়া যেমন হপ হয়ে বসে ছিল তো ছিলই।
আমি বলি,' কী হল, নেও।'
'না। বললাম তো খাব না।'
আমি বলি, 'শোন মায়া, তোমার চেহারা ভীষণ অ্যাট্রাকটিভ। আমার তো রীতিমতো ছবি আঁকতে ইচ্ছা করছে।'
রিকো বলল, 'ও হ্যা, আলো কিন্তু ভালো ছবি আঁকতে পারে।'
রিকো 'আলো'-র সঙ্গে 'ভালো'-টা এমন গোল গোল করে উচ্চারণ করল যে তাতে আরেক দম ফাটা হাসি হল।
আমি বলি, 'ফাজলামি রাখ, সত্যিই আমার তোমার একটা ছবি আঁকতে ইচ্ছা করছে।'
মায়া আমার দিকে তাকাল, আমি মায়ার দিকে। মায়া হয়তো বেঝার চেষ্টা করছিল আমি ঠাট্টা করছি না।
'সত্যি আঁকবেন?'
এমন গাঢ় করে বলল, আমি টের পেলাম আমার ভেতরে কেমন একটা শান্ত অনুভূতি হচ্ছে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেছি। আর হঠাৎ এতক্ষণের হল্লার ভেতরে সিরিয়াস একটা ভাব এস গেছে। মায়ার কথার ভেতরে একটা ভারিক্কি ছিল। পরে শুনেছি আবৃত্তি করত। ওখানেই আরাফের সঙ্গে ওর সম্পর্ক তৈরি হয়। মাঝখানে আমি কিছুদিন মায়ার প্রেমে একবারে মাত হয়ে গেলাম। এসময় বীণা আন্টি ছয়মাসের জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। ওই আমার বলতে গেলে প্রথম প্রেমে পড়ার সবচেয়ে তীব্র অনুভূতি। কিন্তু

আরাফকে ও বিয়ে করল না। বিয়ে করল মোবিনকে। আরাফের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কিন্তু মোবিনকে আমি দেখিনি।

টিনার ধারণা ছিল আমি মায়ার সঙ্গে গোপনে মেলামেশা করছি। বিছানায়টিছানায় গিয়েছি। অথচ আমি মায়ার হাতও কোনোদিন ধরিনি। চুমুটুমু খাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আর বাদবাকি তো বাদই।

রিকোর একটা থিওরি ছিল, 'তুই যদি কোনো মেয়ের হাত ধরতে পারিস তাহলে তুই তাকে চুমু খেতে পারবি, আর চুমু খেতে যদি পারিস তুই তার দুধে হাত দিতে পারবি। আর যদি দুধে হাত দিতে পারিস তাহলে তার সঙ্গে বিছানায় যেতে পারবি।' আমি অবশ্য কোনো থিওরিতে বিশ্বাস করি না। আমি আমার পক্ষ থেকে কোনো মেয়ের দিকে এগুতে পারিনি। আমার ভেতরে যে কীসের দ্বিধা কাজ করে আমি জানি না। মাঝেমাঝে মনেই হত, আমি কোনোদিন কাউকে আদতে ভালোই বাসতে পারব না। অথচ আমি এও জানি আমি কতটা ভালোবাসতে চেয়েছিলাম কতটা গভীরভাবে প্রেমে পড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওই যে গানটা আছে না, একবার যদি কেউ ভালোবাসতো/ আমার নয়ন দুটি জলে ভাসতো/ আর ভালোসতো/ এ জীবন তবু কিছু না কিছু পেত/– আমি এসব অনুভূতিকে কত দূরে ফেলে চলে এসেছি। যে আমি আমার অনাবশ্যক লম্বাটে শরীর নিয়ে বিব্রত থেকেছি। কখনো নিজেকে লুকাতে না-পারা নিয়ে বিব্রত থেকেছি। আমি বীণা আন্টির স্কেলে মাপা উচ্ছিত সাড়ে ছয় ইঞ্চির যাদুদণ্ডটা নিয়ে বিব্রত হয়েছি। নিজেকে নিয়ে এত বিব্রত হতে হতে আমি আমরা নিজের ব্রতটা বারবার ভুলে গেছি।

১৫.

অনেক পরে শুনেছিলাম, কোন শর্তে এই মর্তে। আসলেই কেন এলাম এখানে? আমার নাম আলোপ্তগিন। মানেটা আসলে কি আমি নিজেও ঠিক মতো জানি না। আমার আগে পরে কোনো কিছু নেই কোনো পুরোনাম বা পদবী কিছু নেই। আমি আমার নামের মানে কাউকে কোনো দিন জিজ্ঞাসাও করিনি। নিজেই একটা মানে বানিয়ে নিয়েছিলাম আলো থেকে উপ্ত যে, সেই আলোপ্তগিন। কিন্তু গিন মানে কী? আম্মা কেন আমার এই রকম নাম রাখতে গেলেন? আমার নাম আমার আব্বার নাম সুবুক্তগিনের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা। বীণা আন্টি আম্মাকে বলেছিল, 'কী সব আম্মাা আম্মা বলা শিখিয়েছিলস? তুই না বাঙালি নিয়ে খুব গর্ব করতি।'

আম্মা হেসে বলেছিল, 'শোন বাবা হয় অনেকেই, কিন্তু আব্বা কিন্তু একটাই। আম্মাও তাই। তুই সাধু পুরুষকে বাবা ডাকতে পারিস। গুরু ওস্তাদকেও বাবা বলতে পারিস। কিন্তু আব্বা কিন্তু একটাই। আম্মাও।'

বীণা আন্টি হেসে বলে, 'আব্বাটা মানলাম কিন্তু ভিক্ষুকরা যখন ভিক্ষা চায়, আম্মা দুগা ভিক্ষা দেস তখন?' শুনে আম্মা হাসে, 'ফাজিল।'

আমি তো গুলশান খানের কথা জানি। আমি জানি আমি দেখতে গুলশান খানের মতো। বীণা আন্টি আমাকে বলেছেন, 'কোহি তো তোমার প্রতি সেক্সুয়াল অ্যাট্রাকশন ফিল করে। বিকস ইয়ুয়ার সেম টু গুলশান খান। আর গুলশানের মতো পুরুষ ছাড়া কোহির আসলে কিছু হবে না।' আমি শুনে অবাক হয়েছিলাম। ইডিপাস কমপ্লেক্সে আমার দিক থেকে যেমন আছে তেনমি তার দিক থেকেও সেটা আছে। আমি এখানে এসে আর কনো কিছু মেলাতে পারি না। কত কী ট্যাবু-টোটেমের কাহিনী শুনি। কিন্তু মনে হয় মানুষ আর পশুর তফাৎ চেতনার দিক থেকে অনেক হলেও শারীরিক দিক থেকে কিছু মাত্র নেই। তারপরও আমার শরীরের ওপর একদিন তীব্রভাবে শরীর হাকাতে হাকাতে বীণা আন্টি কেন অমিতের নাম নেবেন? কেন চিৎকার করে বলবেন, 'ফাক মি অমিত ফাক মি হার্ড। আই অ্যাম কামিং অমিইইইইৎ। আই অ্যাম...'। অমিত বিপ্লবী ছিল। প্রথম জীবনে কমিউনিস্ট পার্টি করলেও পরে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। মাঝে মাঝে বীণার কাছে আসত। মাঝারি উচ্চতার গাটাগোট্টা অমিত দস্তিদার।

দেখলে অনেকে নিগ্রো বলে ভুল করতে পারে। মাথার চুল একবারে কোকড়ানো। স্প্রিংয়ের মতো প্যাচানো। কেবল নাকটা খাড়া আর ঠোঁটটা পাতলা। বড় বড় চোখ দুটো সারাক্ষণ আগুনের মতো জ্বলছে। 'আর কী আগুন যে শরীরে নিয়ে বেড়াত। বুকেও।'

বীণা আন্টি অমিতকে বলেছিলেন,'তুমি তো একাই পুড়িয়ে দিতে পারো তোমার যত শ্রেণীশত্রুদের।' বীণা আন্টি বলে যেতেন, 'যদিও আমি অবশ্য ওর ওই সব বিপ্লবটিপ্লবের স্বপ্নটপ্ন নিয়ে ভীষণ বিরক্ত ছিলাম।' আমি বলেছিলাম, 'তুমি বাংলাদেশের সব ধনী-মহাধনী পুঁজিপতিদের বউ মেয়েদের কব্জা কর। তাদের সঙ্গে প্রেম কর। তাদের ফাক কর। তা তো করতে করতে পারবা না। করলে দেখতে অটোমেটিক একটা বিপ্লব হয়ে গেছে।– কথাটা বলছিলাম ওর সঙ্গে লাভমেকিংয়ের সময়।'

অমিত বলেছিল, 'মেয়ে হয়ে মেয়েদের প্রতি তোমার কোনো রেসপেক্ট নাই!' তার কী অদ্ভুত–একেবারে সেই অবস্থায় উঠে চলে গিয়েছিল। তারপর বহুদিন কোনো দেখা নেই। এমন রাগও সে করতে পারে। ও ফিরে এসেছিল নব্বই সালের শেষ দিকে। দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম বাঘের মতো শক্তিমান লোকটা একেবারে ভেঙ্গেচুরে শেষ। অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শুধু বলেছে, 'তুমিই ঠিকই বলেছিলা। একটা আধাসামন্তবাদী দেশে এসব স্বপ্নই থাকবে। সম্পদই নেই, সম্পদের আবার বণ্টন।' আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলাম,'বিপ্লব না হয় হবে না, কিন্তু অনেক ভালো ভালো কাজ তো হতে পারে।'

'ভালো কাজের জন্য মিনিমাম সততা লাগে। পরিশ্রমেও সবকাজ হয় না। দেশে কালো টাকার মালিকরা কি পরিশ্রম করে না? যে কোনো কিছুই কামানো মানেই বিশাল ধকলের ওপর থাকা। নিজেকে খাটানো ছাড়া সাদা কি কালো কোনো কিছুই আদায় হয় না।'

বীণা আন্টির কথাগুলি আরিয়ানাকে বলছিলাম। আরিয়ানা এক সময় বলত, তার বিয়ে করতে ইচ্ছা করে প্রচুর টাকা যার আছে তেমন কাউকে। তারপর কেমন করে যেন মোড় ঘুরে গেল। আমাকে পরে কত বার যে বলেছে, এক সময় তার দিন রাতের সব কিছুর ভেতরে আমি ঢুকে পড়েছিলাম। আমাকে না দেখলে তার ভালো লাগত না। সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে ইচ্ছা করত। আমি অবশ্য তখনও আরিয়ারানার কোনো কিছুকে সিরিয়াসলি নেই। কেবল সে আমাকে বলেছিল বিদেশে না যেতে। কিন্তু আমি বিদেশে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমার ঠিক যখন ফ্লাইট ঠিক সেই দশটায় আরিয়ানা বিষ খেয়েছিল। আমি জেনেছি লন্ডনে নামার পর পরই। আমার কেমন লেগেছিল। প্রথমে একটু থমকে গিয়েছিলাম। তারপর মনে হল ভালোবাসার জন্য মানুষ এও করতে পারে? কিন্তু আমার তো তা দকার নেই। আমি এমন কাজ করতে চাই সবাই যাকে মনে করবে ধ্বংস, আমি তাকে পরিণত করব আমার মুক্তিতে। আমি পাঁচশো বছরের কাজ পাঁচ বছরে করব। এর জন্য যা যা করা লাগে আমি তাও করব। আমি আমাকে নিজে নতুন জন্ম দেব। দেবই। আমি বীণা আন্টিকে ভুলে যেতে চেয়েছি। আমি আরিয়ানার প্রেমকে অগ্রাহ্য করে চলে এসেছি। সে তো আর এমনি এমনি না। আমি জানি, এত পিছু টান নিয়ে সামনে এগুনোই যায় না। কিন্তু আমি এও জানি, একদিন যদি আমি সর্ব্বোচ্চ শিখরেও উঠে যাই আমার তাতেও কিছু এসে যায় না। আমি আসলে কী হতে চাই। আমি কি আরেক ফাউস্ট। আমি তখনও পর্যন্ত গ্যেটের কিছু পড়িনি। কিন্তু গল্পটা শুনেছিলাম। কিন্তু আমার কোনো মেফিস্টেফেলিস বা কোনো মন্ত্রণাদাতা নেই। আমি কাউকে বিশ্বাস কি করতাম? আমি মনে হয় সবাইকেই বিশ্বাস করতাম, কিন্তু আদতে কাউকেই বিশ্বাস করতাম না। রিকোকে ওর এলাকার এক বড়ভাই একটা মন্ত্র দিয়েছিল রিকোর কাছে কথাটা শুনে আমি মনে রেখেছিলাম, লাভ বাট ডোন্ট ট্রাস্ট। ভালোবাসো, কিন্তু বিশ্বাস করো না। রিকো ছায়ানটে গান শিখত। খালি গলায় বেশ ভালোই রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইত। আমাকে দেখলে গেয়ে উঠত,'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো।' পরে এই গানটা এত অর্থপূর্ণ মনে হত। একবার ওর কাছে একটা গান শিখতে চেয়েছিলাম,'তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে/ তারে আপনি রাখিলি বাঁধি। হায়

আলোর পিয়াসি সে যে/ তাই গুমরে উঠিছে কাঁদি।' রিকোর কিছু ব্যাপার ছিল বুঝওত পারতাম না। ও বলত,'যে ভালোবাসা কষ্ট দেয় তা ভালোবাসাই না। ভালোবাসা মানে বিস্তার, ভালোবাসা মানে বিকাশ। এর সঙ্গে বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই। ধর তুই বিদেশে গেছিস তোর প্রেমিকাকে ছেড়ে। সে সময়ে সে যদি কারো সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে সেটাকে তোর খারাপভাবে দেখা ঠিক নয়। বরং না গড়ে তুললেই তোর সন্দেহ হওয়া দরকার। কারো সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হওয়াটা দোষের কোনো বিষয়ই নয়। এর সঙ্গে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই।'

ভালোবাসার সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক কি তাও বুঝতে পারতাম না। ভালোবাসার মানে তো ভালোবাসা। প্রশ্ন যদি হয় কাকে বলে ভালোবাসা? উত্তরটা ভালোবাসাকে বলে ভালোবাসা। টোরা প্যাট্রিক ঠিক এই কথাগুলি আমাকে পরে বলেছিল।

আমি বলেছিলাম, 'কীভাবে?'

'ভালোবেসে দেখো কীভাবে।'

আমি বলেছিলাম, 'কীভাবে ভালোবাসে?'

টোরা বলেছিল, 'তুমি কোনো কথা বলবে না। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে ভালোবাসে।' আমি অনেক পরে হঠাৎ করে বুঝতে পারি টোরাকে আমার ভালোলেগেছিল কারণ টোরার আমাকে হুবহু বীণা আন্টির স্বাদ এনে দিয়েছিল। কীভাবে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ভালোবাসতে হয়। ভালোবাসা আদায় করতে হয় টোরা শিখেছিল ভালোবাসতে ভালোবাসতে। বীণা আন্টির মতো কোনো অবদমন থেকে নয়। ভাবতে অবাক লাগে বীণা আন্টির বাপচাচারা অনেকটা পির বংশের ধারা। পুরো পরিবার হল পর্দার ঘেরটোপের ভেতরে থাকে। তার বাবা তিনটা বিয়ে করেছিল। বীণা আন্টির আসল নামতো সাবিনা আক্তার। মেডিকেলে পড়তে এসে প্রেম হয় অমিতের সঙ্গে। এর অল্প কিছু দিনের ভেতরে লেগে যায় যুদ্ধ। অমিত দস্তিদার ছিল ভয়ানক সাহসি একটা লোক। বীণাকে বলেছিল, সে বিয়েটিয়েতে বিশ্বাস করে না, এই শর্তে তাদের সম্পর্ক হবে। সে-ই সাবিনার বিনাকে বীণাকে বানিয়ে নিয়েছিল। যুদ্ধের পর পরই বীণা একেবারে পুরো দস্তুর হিন্দু নারীর মতো হয়ে যায়। সিঁদুর পরতে শুরু করে। যদিও কোনো দিন পুজোটুজোর ভেতরে সে যায়নি। তখনও অমিতের কোনো খোঁজ নেই। কেবল জানে অমিত বেঁচে আছে। সুস্থ আছে। এবং দেশেই আছে। যুদ্ধের পরপরই অমিত লেগে যায় এদেশে বিপ্লব ঘটানোর জন্য। মাঝে মাঝে গভীর কোনো রাতে বা একবারে মধ্য দুপুরে বীণার কাছে আসত। ঘণ্টাখানিক থেকে চলে যেতে। বীণা ওকে পেলে আর নিজেকে সামলাতে পারত না। বুভুক্ষুর মতো গ্রাস করতে শুরু করত। অমিত বলত, 'আমাকে তুমি দুর্বল করে দিও না। আমি এই জন্য এখানে আসি নি। আমি এসেছি একটা জিনিস জমা রাখতে। তার পর কাপড়ে মোড়ানো ভারি একটা জিনিস বীণার হাতে দিত। বীণা এটা আগামীকার একটা ছেলে এসে বলবে 'নকশি কাঁথা ৭১', এটা হবে ওর কোড তুমি দিয়ে দিবে। দয়া করে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে না।' এসব কথার ভেতরেই বীণা অমিতকে উদোম করে নিজেও খোসা ছাড়াতো। শুরু করলে নিদেনপক্ষে একঘণ্টার আগে ছাড়ত না বীণা।

অমিত বলত, 'কবে তোমার স্রেফ এই জন্য জানটা দিয়ে দিতে হয়।'

'ওমা বিপ্লবের জন্য যে জান দিচ্ছো!'

'সে তো বিপ্লবের জন্য। মরে গেলে বিপ্লব করবে কে?'

কাজটা চলার সময়েই তারা এই রকম অবিরাম কথা বলে যেত। এটা ওটা জানতে চাইত। একদিকে একজন আরেক জনের ভেতরে আসছে যাচ্ছে, অন্যদিকে আলাপ করছে। কখনো ঝগড়া মতোও হত। কখনো ঠাট্টা মতো হত। বীণা আন্টি বলে যেতে, 'বুঝলে সে এক অদ্ভুত দিনগুলি ছিল। আমার কাছে এগুলিই ছিল হারানো দিনের গান।'

'আপনি এগুলি আমার মধ্যে কেন ঢুকিয়ে দিতে চান?'

‘আমি রিলিভ পাই।’
‘না বললে ভালো হত না।’
‘এগুলি আমার সবচেয়ে মধুরস্মৃতি আর আনন্দের স্মৃতি বলতে আমার ভালো লাগে। কেন তোমার ভালো লাগছে না?’
‘না।’
‘না!’
‘হ্যা, আমার ভালো লাগছে না।’
‘ঈর্ষা হচ্ছে?’
‘একটু তো হচ্ছেই।’
‘একটু না, বল অনেকক্ষাণিই হচ্ছে।’
‘হ্যা, আপনি যদি এখন অমিতকে পেতেন তাহলে কি আমরা কোনো প্রয়োজন হত?’
‘হত।’
‘কী জন্য?’
‘কারণ পানির স্বাদ পানিতে। পানি খেতেই হয় বেঁচে থাকতে হলে কিন্তু কেবল পানি খেয়েই একটা লোক বেঁচে থাকতে পারে না।’
‘আমি কোনটা? আপনার তৃষ্ণার জল না অন্য খাদ্য।’
‘তুমি আমার কাছে কী তা তুমি জানো। আর তুমি আমার কাছে আসো যতটা না আমার দরকারে তার চেয়ে তোমার দরকারেই বেশি।’
‘আমার দরকারে?’
‘হ্যা।’
‘কারণ তুমি আমার দেহের প্রেমে পড়েছ। আমি তোমাকে যে প্লেজার দিতে পারি তা তুমি পেতে পছন্দ কর। আমাকে তুমি ভালোওবাসো আবার মনের গহীন গভীরে আমার জন্য তোমার একটা তীব্র ঘৃণা আছে? কী বল নেই?’
আমি চুপ করে থাকি।
বীণা আন্টি বলেন, ‘আমি অবশ্য এতে কোনো দোষ দেখি না। তুমিও জানো এটাই বরং তোমার আমার জন্য প্রেমকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সোনার গয়না যেমন খাদ ছাড়া শক্তপোক্ত হয় না, ভালোবাসার পাশাপাশি সেই গহীন গোপন ঘৃণা আসলে তোমার ভালোবাসাটাকেই বাঁচানোর অনুঘটক হয়ে কাজ করে।’
আমি চুপ করেই থাকি।
‘কী হল কথা বলছ না যে?’
‘শুনছি।’
‘কিছু বল?’
‘কী বলব?’
‘এটা সত্য বললাম না কি মিথ্যা বা বেঠিক বললাম।’
‘আপনার ফ্রয়েড কী বলেন?’
‘আমি ফ্রয়েড থেকে এসব বলিনি; আমি বলেছি আমার জায়গা থেকে।’
‘যেখান থেকেই বলেন না কেন, যদি মন্তব্য করতে বলা হয়, তাহলে বলব ভালো হয়েছে। অত্যন্ত উন্নতমানের অ্যানালিসিস।’ আমর কথার ভেতরে যে আমি না চাইতেই একটু বিদ্রূপ ঢুকে পড়েছিল আমি বলার পরও টের পেলাম।

'অত্যন্ত উন্নমানের অ্যানালিসিস' এই কথাটার ভেতরে সেই বিদ্রূপের স্বরটা চিনতে কষ্ট হয়নি বীণা আন্টির।
'তুমি ঠাট্টা করছ আমি জানি।'
'সরি; আমি আসলে ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি।'
'না চাইলেও তোমার মনের ভেতর থেকে কথাগুলি কিন্তু নিজের মতোই বেরিয়ে এসেছে।'

১৬.

পরে আমি একা একা ভেবে দেখেছি, সত্যিই তাই আমি কেন এমন করলাম। আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম, বীণা আন্টি তার সত্যিকারের কথাগুলি আমাকে বলছে। কেন বলছে? কারণ আমার ওপর তার আস্থা আছে। আস্থাটা আছে কারণ তিনি জানেন আমি তাকে ভালোবাসি, আর তাকে মনেপ্রাণেও চাইও। এমন কি তাকে বিয়েও করতে চেয়েছি। তিনি তার নিজেকে আমার কাছে বোধকরি সবচেয়ে পরিষ্কার করে তুলে ধরতে চেয়েছেন– আর আমি তাকে বারবার ভুল বুঝছি? আমি জানি একটা সময় আমি তার কাছে গিনিপিগের মতো ছিলাম। কিন্তু তিনিও আমার প্রেমে পড়েছিলেন। এখনো পড়ে আছেন হয়তো। আমার তো মনেই হয় প্রেম আর জ্ঞান একটা চলমান প্রক্রিয়া নদীতে নেমে থাকার মতো। নদী থেকে উঠে গেলেই যেন এর স্রোতের সঙ্গে থাকার হয় না, তেমনি প্রেম আর জ্ঞান সরে গেলেই গেল। এই জন্য অনেক ডক্টরেটফক্টরেট ডিগ্রি নিয়েও পরে মূর্খতে পরিণত হয়। কারণ তারা তখন জ্ঞানের নদী থেকে সরে যায়। জ্ঞানী হয়ে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। সত্যিই এটা নিত্য শান দেওয়ার মতো ব্যাপার। কিন্তু আমাদের তো আর শান দেওয়া লাগে না। আমি নিজেই কতদিন কোনো বইয়ের ধার ঘেষি নি। এটা ওটা টুকটাক পড়া হয়, কিন্তু পড়া বলতে যা বোঝায় কোনো ভালো বই যেটা পড়লে নিজের একটা স্তরায়ণ ঘটে কত বছর যে তেমন কোনো গল্প-উপন্যাস বা ইতিহাস দর্শন কিছুই আমার পড়া হয়নি হিসাবও করিনি। হিসাব করলে হয়তো গত পাঁচটা বছর আমার এই ভাবেই কেটেছে। আমি আসলে বিদেশের জীবনের সঙ্গে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে মিশে যেতে চেয়েছিলাম। অনেকেই বলেছিল, যেও না। এটা জেনে শুনে বিষ তো ভালো বিষ খেলে বেঁচে আসার সম্ভবনা থাকে, এটা হল জেনে শুনে মৃত্যুপান। কিন্তু আমি মৃত্যুপানই করতে চেয়েছিলাম। ডেথ ইজ ওনলি বিগিনিং। যেকোনো মৃত্যুই হল আসল জীবনের শুরু। আমি মরে বেঁচে উঠতে চেয়েছিলাম। আমি জানি না কতখানি তা পেরেছি। কিন্তু আমি জানি আমি আমার অনেককিছু হারিয়ে ফেলতে ফেলতেও ফেলিনি। আমি এমন একটা বিশ্বাস করেছিলাম যে, পৃথিবীর যেখানেই যাই না কেন জীবন সবখানেই জীবন। আমি সেই জীবনটাকে যাপন করতে চেয়েছিলাম। এখানে আসার পরপরই আমি পড়েছিলাম একটা গরম তাওয়ার ভেতরে। কয়েকদিন আগে টুইনটাওয়ারের ঘটনা ঘটে। সারা বৃটেন জুড়ে উত্তেজনা। মিছিল। মানুষের চোখমুখ থেকে হাসি মুছে গেছে। প্রথমে উঠেছিলাম ব্রিকলেনের আমার এক সিলেটি বন্ধু ডেরায়। ডেরাই বলব এটাকে ঠিক বাসা বলা যায় না। পাখির যেমন খোপ, ওর তেমনি ডেরা। ওইটুকু দুই রুমের বাসায় প্রতি মাসে বান্ধবী পালটে পালটে থাকে। ওকে একটা বাঙালিও দেখতে পারে না। রোজ রাখে না। নামাজ পড়ে না। ফতির বলছিল, 'দেশে থাকতে কেউ চোখেও দেখত না, আমি কী করি না করি– এখানে এসে পুরো কমিউনিটিতে রটে গেল আমি একটা বেদ্বীন লোক।' বেদ্বীন। কতদিন পর এই কথাটা শুনলাম। 'আমার এই ভালোবাসা যেন জীবনেমরণে বীরের গলার মালা হয়'– রুনা লায়লার গাওয়ার গান। মেয়েরা তাহলে বীরকেই খোঁজে। ছোটবেলায় 'বেদ্বীন' আর 'বারুদ' নামের দুটো ছবি দেখার জন্য কী যে হন্যে হয়েছিলাম– একটাও দেখতে পারিনি– কেবল ইত্তেফাকে বড় বড় করে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। নায়িকা

অলিভিয়ার নাম মনে আছে। চেহারাটাও। আমাদের বন্ধু জিতুল বলত, 'বিয়ে করলে অলিভিয়ার মতো সুন্দরী বিয়ে করবে।'
আমি বেদ্বীন ফতিরের বাসায় সেসময় উঠতে পেরেছিলাম ওর তখন কোনো কাজকর্ম ছিলা না বলে। আমি মোটামুটি একবছর চলার মতো টাকা নিয়ে এসেছিলাম। এমন জোর দিয়ে বলেছিলাম, যাদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলাম তাদেরকে, যে দুই বছরের ভেতরে সব শোধ করে দেব। আমি শোধ করেছিলাম দেড় বছরের ভিতরে। লন্ডনের একটা রেস্টুরেন্টে কিছুদিন প্রথমে কাজ করি।
মালিকের কাছে শুনি,'তোমরা বাঙারিরা ভীষণ হারামি আছো। আমাদের দোকানে কাজ করতে বেশি টাকা নেও, আর তোমাদের জাতভাইদের দোকানে কম টাকায় কাজ কর। এজন্য এখন আমরা ওরা যা দেয় আমরাও তাই দেই।'
আমি বলেছিলাম, 'তাহলে তো তোমাদেরই দোষ। বরং তোমরা ওদের বাধ্য করতা তোমাদের সমান টাকা দিতে। তোমারা তা না করে নিজেরা বাঙালিদের মতো হয়ে গেলা। সত্যিই ট্রাজিক। তোমরা বাঙালিদের তোমাদের সমান করে তুলবা কি তোমরাই বাঙালিদের মতো হয়ে গেলা। গত তিনযুগে এখানে বাঙালিদের যে কোনো উন্নতি হয়নি এজন্য ওরা তো দায়ি, তোমারাও যে কম দায়ি না এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে।'
মালিক জন স্টিফেন স্মিথ আমাকে পছন্দ করেছিলেন। 'তোমার ফ্রাঙ্ক আর ফ্রিনেসটা আমার ভালো লেগেছে।'
আমি এখানে কাজ করার সময় কাউকে জানাতে দেইনি যে আমি ইঞ্জিনিয়ার মানে বুয়েট থেকে পাস করা কেউ। আমি একজন স্থপতি। মনে হল আমি এমনই এক স্থপতি যে নিজেকেই গড়ে তুলতে পারিনি। আই অ্যাম নট দি আর্কিটেক্ট অব মাই ওন লাইফ।

১৭.

আমি আসলে কেন দেশ ছাড়লাম? প্রথমে কিছুদিন খবরের কাগজে তারপর কিছুদিন একটা নাটকের গ্রুপে কাজ করে আমার চোখ খুলে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে ধুম আড্ডার ভেতরে কত কথা যে হত। যাদের নক্ষত্রের মতো ভাবতাম তাদের বাড়ি খবর, হাড়ির খবর সব বের হয়ে আসত। সেদিনগুলো ছিল নক্ষত্র পতনের দিন। মনে করার পেছনে যে মনটা তার ভাঙচুর। সবকিছু একবারে ন্যাংটা দেখতে পারতাম। দেশের হোমরাচোমরা যার দিকেই তাকাতাম মনে হত কারো গায়ে কোনো কাপড় নেই। নানান ক্ষেত্রে যারা চাঁই হয়ে বসে আছে তাদের এমন হাস্যকর রকমের স্টুপিড লাগতে শুরু করল যে নিজেকেই আমার অসহ্য লাগা শুরু হয়েছিল। আর সেই ন্যাংটামির যে তেজ তাতে চোখকে রোদ চশমা পরেও ঠেকানো যেত না।
এই সময়টায় আমি ঘন ঘন বীণা অন্টির কাছে গিয়েছিলাম। তাকে খুলে বলেছিলাম আমার সমস্যাগুলি। বলেছিলেন, 'আমি দেখাটাকে বদলে নিলেই পারি। তাহলে অনুভবও বদলে যেতে পারে।'
'আমি দেখাকে বদলাব কীভাবে? তাহলে চোখ বদলাতে হবে। চোখ বদলিয়েই বা কী হবে? বদলাতে হবে তো মগজ।'
'তা মন্দ বলনি। কিন্তু তোমার সমস্যাটা সত্যিই আজব।'
আসলে আমিও জানি তা কতটা আজব। আসল কথাটা নিজেও ঠিক নিজের কাছে স্বীকার করতে চাইছিলাম না। কিন্তু তা-ই যে আসল কথা আমি সে ব্যাপারেও নিশ্চিত নই। আমি আসলে বেদ্বীন হয়ে যেতে চাই। আমি কোনো পরিচিত মুখের সামনে পড়তে চাই না। কারো সঙ্গে চোখাচোখি পর্যন্ত করতে চাই না। রাস্তায় দেখা হলেই এটা নিত্য দিনের কথা–
'কেমন আছেন?'

'ভালো। আপনি?'
'আল্লায় রাখছে আর কি।'
বা 'আছি তোমাদের দোয়ায়'–এসব কথার কোনো দেওয়া-নেওয়া আমি চাই না। বীণা আন্টির সঙ্গে প্রথম মোকবিলায় আমি কোনো মতেই ভুলতে পারছিলাম না যে আমি একটা মহাঅন্যায় করেছি। মেয়েদের সঙ্গে মেশা তো দূরের কথা, যখন থেকে বোধ হল তখন থেকেই কারো সামনে ন্যাংটা হওয়ার মতো লজ্জা যে আর কিছু নেই তা তো জেনেছিলাম। আর ছেলে মেয়ে মিলে একসঙ্গে ন্যাংটা হয়ে কিছু করার ব্যাপারটা কবে থেকে জেনে ছিলাম? ব্যাপারটা যে পাপ তা-ই বা কবে থেকে জেনেছিলাম? কোনো বইতে কি পড়েছিলাম? কীভাবে আমার এ ব্যাপারে বোধ জাগল তাও ঠিক মনে করতে পারব না। তবে মনে আছে, তখন সিক্সে পড়ি। আমার মামার এক কী সম্পর্কের বোন মাদারীপুরে বেড়াতে এসেছিলেন। যেটাকে আমরা বসারবার ঘর বলি সেটাই ছিল আমাদের গেস্টরুম। সেখানে তিনচার রাত থেকে ছিলেন। একদিন দুপুর বেলা বাসায় কেউ ছিল না। সেই বোন আমাকে ডাকছিলেন, গিয়ে দেখি– সেই প্রথম কোনো মহিলাকে আমার সেভাবে দেখা– তখন যে গায়ে থাকা দুটো খোপখোপ চোঙ্গার মতো বুক ঢাকার জিনিসকে ব্রা বলে জানতাম না। তবে পেটিকোট চিনতাম কিন্তু এটাকেই যে সায়া বলে তাও জানতাম না। দেখি গিয়ে, তিনি পেটিকোট আর ব্রা পরা। এত চওড়া বাস্ট লাইন আমি আর কখনো দেখিনি। আমি ঢুকতেই সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে বললেন, আমার হুকটা একটু খুলে দেও তো। আমি দুই হাত দিয়ে ব্রার পিছনে বাঁধুনিটা আলাগা করে দিতেই তা শুধু দেখেছিলাম বগলের পাশ দিয়ে বিশাল দুটো স্তনের একটা ঝুলে পড়ে গেল। এই পতনের কোনো শব্দ হল না। পুরো পিঠ একেবারে উদোম হয়ে গেল। পিঠের মাঝখানটা কলাপাতার মতো। পরে কোথাও পড়েছিলাম তার কলাপাতা তার পিঠ ঘেষে কাছে আসা আর দূরে সরে যাওয়া– পড়ে ওই ছবিটা আমি দেখতে পেতাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, ঠিক আছে থ্যাংক ইয়্যু, যাও। থ্যাংক ইয়্যু-টা টেনে টেনে বলেছিলেন। আমি কোনো দিন সেই স্বরটিকে মুছতে পারিনি। আমি এখনো শুনতে চাওয়া মাত্র শুনতে পারি। আর মনে হয়, সেটাই আমার জীবনে কারো কাছ থেকে প্রথম থ্যাংক ইয়্যু পাওয়া। ব্রার হুক খুলতে সাহায্য করে থ্যাংক ইয়্যু পাওয়ার–এই ঘটনাটা কত বছর পরই প্রথম বলেছিলাম টোরাকে। টোরা তো হেসেই গড়িয়ে পরে।
'তোমার কপাল ভালো। ফাঁকা বাসা– উনি চাইলেই কী না ঘটে যেতে পারত।'
'কী ঘটে যেতে পারত?'
আমি জানি টোরা কী বলবে তাও প্রশ্ন করি।
টোরাও বলে, 'তুমি খুব ভালো করে জানো কী ঘটে যেতে পারত।'
'আহা আমি তো আমারটা জানি তুমি তোমারটা বল।'
'কী আবার, প্রথম অভিষেক।'
তবে অভিষেক একটা হয়েছিল। তিনি চলে যাওয়ার পরে সেই ঘরের বিছানার তোষকের নিচে আমি একটা পত্রিকা পাই। ইংরেজিতে সাদারঙে তার মটালে লেখা শব্দটা আমার সামনে বরফের মতো জ্বলজ্বল করতে থাকে। সেই শব্দটার একটা শব্দ আবার ঢেকে দিয়েছে এক মাথা সোনালী চুলে মেয়েটা। যে একটা হাতে তার বুক আর অন্য হাতে তার উরুসন্ধি আড়াল করে রেখেছিল। তবে তার গায়েও একটা কাপড় ছিল– খাকি রঙের একটা কোটির মতো–সেটা কাঁধের দুপাশ থেকে কোমর পর্যন্ত ঝুলে ছিল। আমি পত্রিকাটা আমাদের ঘরের ওপরে একটা তাক ছিল ছিল, সেখানে অপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিপত্র রাখা তার ভেতরে রেখে দিয়েছিলাম। প্রায় মাঝে মাঝে দেখতাম।
ঠিক অদ্ভুতভাবে এর কিছুদিন পর আমাদের স্কুলে নতুন আসা নিপুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ওর বাবা পুলিশ অফিসার। নিপুরা খুব অল্প সময়ের জন্য এসেছিল। নিপুই নিজে আমার সঙ্গে একদিন টিফিনের সময় কথা বলতে আসে। আমি তেমন একটা সায় দেইনি। নিপুই আমার সঙ্গে মিশতে চাইল। আমাকে

কখনো হাতে একদিন একটা লম্বা ধরনের একটা মোড়ক গুজে দিয়ে বলেছিল, তা মামা লন্ডন থেকে এনেছে। সেই প্রথম কি কারো মুখে লন্ডন কথাটা শোন? আমার ঠিক মনে নেই। কেবল যেটা মনে আছে সেটা হল, নিপুরা যে বাসায় উঠে ছিল তার সিঁড়ি ঘরে রাখার একটা ড্রামের ভেতরে একটা পত্রিকা আর একটা গল্পের বই। পত্রিকার নামও মনে আছে 'জলসা' আর বইটা নাম 'আদিরসের গল্প'।
'তোকে একটা জিনিস দেখাব। চল।'
'কী জিনিস?'
'আগে চলই না।'
'তারপর দেখবি।'
নিপু যেন গোপন অভিযানের মতো তাদের সিঁড়ি ঘরে নিয়ে গেল। মাদারিপুরের শহরের একোবরে মাঝখানে ওরা একটা তিনতলা বাড়িতে ভাড়া থাকে। তারপর আমি নিজেই সেই প্রথম পত্রিকাটা আর গল্পের বইটা নিয়ে আসি। পড়ে পড়ে আমার শরীর কেমন করে ওঠে। এর ভেতরে ক্লাস সেভেনে একদিন ক্লাসে তরল চিন্তা নিয়ে আমাদের কায়সুল আজিম স্যার কীসব কথা বলেন, ডা. লুৎফর রহমানের একটা লেখা পড়াতে গিয়ে– তরল চিন্তা একবার যদি কারো মাথায় ঢোকে তাহলে আর রেহাই নাই। আমি তত দিনে তার হিসাব অনুযায়ী তরল চিন্তার জল গায়ে ঢালতে শুরু করেছি।
জলকে কি জল দিয়ে ভেজানো যায়? আগুনকে আগুন কতটা পোড়াতে পারে? যতটা ভেজে ততটাই উত্তপ্ত হয়। যতটা উত্তপ্ত হয় ততটাই ভিজে যায়। আমি ততটাই গুটিয়ে যেতে থাকলাম নিজের ভেতরে। আমার চোখে হাজারো ছবি ভেসে উঠতে থাকে। আমি কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না। আমি কেবলই লুকানোর জায়গা খুঁজতাম। কীভাবে আরো একা হয়ে যাওয়া যায় ভাবতাম। আমি এমনকি নিপুর সঙ্গেও কথাবার্তা কমিয়ে দিলাম। অথচ আমি সেই পত্রিকার গল্পগুলি আর বইইয়ের গল্পগুলি কতবার পড়েছিলাম জানি না। একটা অস্থিরতা আমাকে পাগল করে তাড়া করত। আমি প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চেপে সেটা চেপে রাখতাম। কিন্তু কোনোমতেই চেপে রাখতে পারতাম না। শেষে একদিন সেই ইংরেজি পত্রিকাটা বাংলা পত্রিকাটা আর গাল্পের বইটা নিয়ে বাসার কাছে একটা ঝোপের পিছনে নিয়ে তাতে কেরাসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দিরাম। চোখের চোখের সামনে দেখছিলাম কীভাবে আগুন খেয়ে ফেলছে মেয়েদের উদোম ছবি গুলিকে আর পত্রিকা আর ওই বইটার সব অক্ষরকে। কিন্তু আমার মগজ থেকে সেগুলি সরাতে পরছিলাম না। নিজেই উপায় বের করে ঠিক করলাম নামাজ পড়তে শুরু করলাম। রোজার দিনে রোজ রাখতে শুরু করলাম। এদিকে বাসার কেউ রোজা রাখে না। নামাজ পড়ে না। আমাদের পরিবারে সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ হত তারা সবাই এই এলাকায় বাইরে থেকে আসা লোকজন। তাদের কেউ অল্প কদিন এখানে এসেছে। তাদের সবার বদলির চাকরি। নিপুর মাকে এর ভেতরে একদিন দেখেছিলাম। বড়বড় ফ্রেমের রোদ চশমা আর ফিনফিনে শাড়ি পরা। আমি সেদিন নিপুর বাসার দিকে যাচ্ছিলাম। দেখে আমার পত্রিকার কেটা গল্প মনে পড়ে গিয়েছিল। কত রকমের গল্প যেছিল। 'ময়নাপাখি' নামে একটা গল্প ছিল একমাদ্রাসা শিক্ষকের। নিজের এক ছাত্রের সঙ্গে ময়নাপাখি ময়নাপাখি খেলতে গিয়ে রক্ত বের করার গল্প। আমার মনে আছে সেই বয়স থেকে আমি কারো ছোঁয়া পছন্দ করতে পরতাম না। বিশেষ করে পুরুষ মানুষের।

১৮.

একটা ঘরে আমি আর টিনা আপা থাকতাম। প্রথম দিকে এক খাটেই শুতাম। ঠিক সিক্সে পড়ার সময় দুটো আলাদা খাট করে দেওয়া হয়। আর নাইনে এইটে ওঠার সময় আমরা একটা নতুন বাসায় উঠি সেখানে পাঁচটা ঘর ছিল। সেখানে আমরা সবাই আলাদা আলাদা ঘরের বাসিন্দা হয়ে উঠি। আমি এসময় রোজা রাখতে শুরু করলে কেউ কোনো কথা বলেনি। আম্মা আমার জন্য সেহেরিতে উঠতেন। নিজে রোজ রাখতেন না, কিন্তু আমাকে যত্ন করে খাওয়াতেন। মামা কিছু বলতে না। কারণ আমি নামাজ রোজা

দুটোই করতাম। তারাবি পড়তে মসজিদে যেতাম। একটা জিনিস মনে পড়ে, আমি কখনো আম্মাকে মাথায় কাপড় তুলে দিতে দেখিনি। এমনকি আজান শুনেই মেয়েরা যেভাবে মাথায় কাপড় দেয়। বীণা আন্টি বলত, কোহি ঢেকে ঢুকে চললে কি হবে, ভেতরে ভেতরে সবসময় তেতে থাকা একটা মেয়ে। তুমি তো জানো না তোমার মায়ের ভেতরে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। কেবল তোমার দিকে তাকিয়ে নিজেকে ও প্রতি পলে সামলে রেখেছে। তোমরর মা যে নায়িকা হতে চেয়েছিল জানো?

'না।'

'তোমার নানির কাহিনী জানো?'

'তাহলে তো তুমি কিছুই জানো না।'

'আপনাকে সে সব কে বলেছে।'

'তোমার মা।' তিনি বলেন,'ক্লাস ফাইভ থেকে তোমার মা আর আমি একসঙ্গে পড়েছি। ওর কবে মিনস হয়েছিল আমি জানি, আমরাটাও ও জানে। ও কেমন ছেলে পছন্দ করত, ছেলেদের নিয়ে কীভাবে সব কিছু আমাকে বলত। এমনিতে বেশ চাপা স্বাভাবের। বোমা মারলেও কিছু বলবে না। কিন্তু যাকে বলবে তাকে সব বলবে। আর মনে হয় একমাত্র আমি যাকে ও জীবনের কোনো কথাই লুকায়নি। আমি তোমাকে এসব বলছি কারণ আমাদের সত্যটা জানা দরকার। ইডিপাসের মতো চোখ অন্ধ করে বেঁচে থাকার কোনো মানে সেই।'

আমি তখন এসব কথার কোনো মানে বুঝতে পারছিলাম না। আম্মা ঢাকায় বীণা আন্টির কাছে রেখে চলে যাওয়ার পরে দুয়ার বন্ধ করে আমার দিকে ফেরা বীণা আন্টি তাকানোটায় কেমন যেন নতুন কিছু ছিল। তার কাছে আমাকে রেখে যাওয়া কেন? পরে জেনেছিলাম আমার আম্মাই চাইছিলেন আমি যেন এইসব ধর্মকর্ম থেকে বেরিয়ে অসি। এসব তার কাছে বিষাক্ত মনে হয়। আমার এসব তিনি মেনে নেন, কিন্তু চান না আমি একদিন কোনো কাঠ মোল্লা টাইপের মানসিকতার কোনো লোকে পরিণত হই। মনে করে ছিলেন হয়তো সবার আগে তাকেই আমি অস্বীকার করব। প্রচণ্ড ঘৃণা করতে শুরু করব। তার এই ভয়টা ছিল।

বীণা আন্টি তার ইনসাইড আউট করে দিলেন। আমি দেখেছিলাম নিপুর আম্মা যতই ওমন পাতলা ফিনফিনে শাড়ি পরে হাতাকাটা ব্লাউজ পরে বের হন, তিনিও আজান দিলে মাথায় কাপড় দেন। রোজার সময় রোজা রাখেন। তারপর চুল বাবকাট করেন কদিন পর পর। আর বীণা আন্টি একেবারে স্কুলশিক্ষিকার মতো শাড়ি পরেন। ব্লাউজের প্রান্ত যেখানে শেষ সেখানে শাড়ির প্যাঁচ শুরু আর চুল ছেড়ে কখনো বের হন না। বড় গলা কি পিঠ খেলা ব্লাউজ হয়তো পরেন মাঝে মাঝে, কিন্তু চোখে থাকে রোদচশমা, কপালে বড় একটা লাল টিপ। সাদা শাড়ি লাল পাড়ে একেবারে স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের মতো মনে হয়। মদ সিগারেট কখনো খান না। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম করেন। বই পড়েন, গান শোনেন, সিনেমা দেখেন, বেড়াতে বের হন আর যে সময়টায় শরীরের খিদা পায় তার ছেলেবন্ধুদের খবর দেন। এই বয়সে তার বয়ফ্রেন্ড আছে এত সহজ করে বলেন যে তাকে স্কুলহার্ল স্কুলগার্ল মনে হয় যদিও পরে 'মেট' নামের তাদের বদলে দিয়েছিলেন। আমার মেট। সোজা বাংলায় সঙ্গি। আরো সুস্পষ্ট করে বললে, শয্যাসঙ্গি এবং একেবারে কাঁচা বাংলায় বললে নাং। আর সাধু বাংলায় বললে নাগর। আমি অবশ্য তার মুখ থেকেই এই সব শুনেছি। বললেন, 'জীবনে এত ঝামেলা বাড়িয়ে কি লাভ। আমি একা একাই স্বস্তি পাই। খিদা পেলে যেমন বাজার থেকে চাল ডাল কিনতে হয়, তেমনি শরীরের খিদা পেলে আমি খবর দেই। লোক এসে যায়। আমি তাদের সঙ্গে কোনো মানসিক বন্ধনে জড়াতে চাই না। তার মানে আমার কোনো প্রেম নেই তা কিন্তু নয়। আমি একটা আকারহীন প্রেমিককে ভালোবাসি। আমি, সেই, মনে পড়ে, ক্লাস সিক্স থেকে একটা পুরুষের মুখ আঁকার চেষ্টা করতাম কিন্তু কোনোমতেই সেটা সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। আমি চাইতাম সে-ই লোকটাই আমার জীবনে আসবে। কিন্তু আমি জানি

কোনোদিনও সে আসবে না। কিন্তু সেই আমার প্রেম সেই আমার স্বস্তির আশ্রয় হয়ে আছে। আমি জানি না, মানুষ এমন একটা প্রেম ও আশ্রয়ের জায়গা থেকেই খোদাকে তৈরি করেছিল কিনা।'
আমি তার কথা বুঝতে পারতম না। খোদাকে মানুষ বানিয়েছে? খোদা একটা ধারণা মাত্র? এটা কীভাবে সম্ভব? তিনি বলতেন, 'নিরাকারের প্রতি এই যে আস্থা এটাও মানুষের ব্যাসিক ইন্সটিঙ্কট। আমাদের প্রবৃত্তির ভেতরেই এটা রয়ে গেছে। আর এজন্য আমরা এই ধারণা থেকে সরে আসতে পারিনি। দশলক্ষ বছর যদি হয় মানুষের এই পৃথিবীতে বসবাস তাহলে সে কেবল মাত্র এক ঈশ্বরের ধারণা লাভ করেছে আটন'হাজার বছর হল। তাহলে সময়টা কী পরিমাণ লেগেছে ভাবা যায়।' আমার সঙ্গে অবশ্য প্রথম দিকে এসব বলতেন না। প্রথমে আমাকে তিনি কেবল আমার শরীরটা চিনিয়েছেন। কীভাবে শরীর অনুভব করে। শরীর কীভাবে অন্য শরীরের প্রতি সাড়া দিতে পারে। আমি তাকে বলেছিলাম, আমি কোনো ফ্যান্টাসিতে যেন না ভুগি। তিনি বলেছিলেন, 'এই জন্যই যে আমি ফ্যান্টাসিতে ভোগার জিনিসগুলি তোমার কাছ থেকে নিঙড়ে নিয়েছিলাম।' কিন্তু আমি যেবার প্রথম তার কাছ থেকে ফিরে আসি আমি বুঝতে পারছিলাম না কী থেকে কী হয়ে গেল। সর্ম্পূণ আড়ালে থাকা একটা দিক আমার কাছে এমন দিনের আলোর মতো খোলামেলা হয়ে গেল যে আমি প্রথম প্রথম মেনেও নিতে পারলাম না। আমি কেবল বলেছিলাম, 'গুনাহ হবে।' সঙ্গে সঙ্গে তার হাসতে হাসতে শাব্দিক অর্থেই গড়িয়ে পড়া দেখেছিলাম। আমাদের কারো গায়ে তখন একটা সুতোপর্যন্ত নেই। তার হাতে মুঠায় আমার বিষাণসংগীত বেজে উঠতে শুরু করেছে। অন্যদিকে মন বলছে– না, না। আমি কোনোদিনও সেই প্রথম দৃশ্যটিকে মুছতে পারিনি। আসলে এ ধরনের প্রথম অনেক কিছুই কখনো মোছা যায় না। যেমন টোরার সঙ্গে প্রথম দৃশ্যগুলি। টোরাকে মনে হত পুরো একটা নাচ দিয়ে তৈরি মানুষ। সারাক্ষণ সে নাচছে। আনন্দে একেবারে টইটুম্বুর হয়ে আছে। কিন্তু কোনো একটা তলে গিয়ে আর কাউকেই ঠিক বোঝা যেত না। মানুষগুলি কেমন একটা ধন্দের মতো হয়ে উঠত। আমি নিজেরই অনেক কিছুই একটা পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে আর বুঝে উঠতে পারতাম না।

১৯.

অনেক কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে অজানা একটা জগতের দিকে রওনা হয়েছিলাম। সবার অজ্ঞাতে গহীন বনে মাটি খোঁড়ার মতো ব্যাপার এটা। নিজেই খুঁড়তে শুরু করে হঠাৎ দেখি আগে থেকেই একটা সুড়ঙ্গ তৈরি আছে। কিছু দূর গিয়ে দেখি ডানে বামে আরো দুটো সুড়ঙ্গ মুখ আছে। কিন্তু আমার সমানের পথটাই বেছে নিয়েছি বার বার। অবিরত চোখে সামনে ডানে বামে কোনায় কেবল নতুন নতুন সুড়ঙ্গ মুখ– কিন্তু আমি কেবল সামনে চলেছি। দশ দিকের নাম আছে, কিন্তু সামনে ও পেছনের দিকের আলাদা কোনো নাম নেই। এক দীর্ঘাঙ্গী নারী আমাকে সেই অন্ধকার গুহার ভেতরে হঠাৎ মশাল নিয়ে এসে হাজির হল। তার দীঘল চুলে আরো অন্ধকার করে রেখেছে তার পেছনের দৃশ্যপট। ঢেকে গেছে পিঠ। ভদ্রমাসের পাকা তালের মতো ভারী আর বিকট-বিশাল তার দুই স্তন। একমুঠো কোমারের নিচে ঘড়ার মতো বিশাল ছড়ানো নিতম্ব। আগুনে জ্বলজ্বল করছে তার মধুবর্ণা নির্মেদ শরীর। সুড়ঙ্গের ভেতরে আমি দেখলাম গনগনে আগুনের আলোয় ওই ভর যুবতী জীবন্ত ভাস্কর্যের মতো আমার সামনে উদয় হয়ে বলছে, 'এসো। ভয় নেই এসো।'
সে মশালটাগুজে রেখে দিল গুহার ভেতরে একটা খোড়লে। তারপর সুড়ঙ্গের ভেতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে সে এক মানবিক আনবিক পারমানবিক বিস্ফোরণের চূড়ান্তে নিয়ে গেল। দেয়ালের দিকে উবু হয়ে থাকা, হাতের কনুই পর্যন্ত দেয়ালে বিছিয়ে– তার নিতম্ব উচিয়ে সেই অনিন্দ্য ভঙ্গির সামনে আমি নিজেকে কোনো মতেই সামাল দিকে পারিনি।

সে বলেছিল, মানুষ অনেক কিছুই নিজের মতোই শিখে নিতে পারে। শেখানোর আগে অনেককিছুই শিখে বসে থাকে। চরম পুলকের পর সারসত্তকে বুঝে নেওয়ার আগেই আমার দিকে প্রশ্ন আসে,'আমি কি এর শেষ দেখতে চাই কি না? আমি কি আরো সামনে যাবো নাকি ফিরে যাব।'

আমি বলি, 'ফিরে যাওয়ার ভেতরে কোনো রোমাঞ্চ নেই। আমি সামনে যেতে চাই। আর সে পথ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর, দীর্ঘতর থেকে দীর্ঘতম হোক; যাতে আমার ভেতরে ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা তৈরি না হয়।'

'এই তো সাহসী পুরুষের মতো কথা।'

'কিন্তু আমি তো একা যেতে চাই না।'

উত্তর আসে, 'তোমাকে একাই যেতে হবে।'

'আমি আমার চিরসুখকে সাথে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।' তিনি আমার হাতে মশাল দিয়ে বললেন, 'সামনে যেতে থাক। বিপদ হয়ে কেবল পেছন ফিরে ডাক দিয়ো, কিন্তু পেছন ফিরে কাউকে সাহায্যর জন্য ডাকা কোনো পুরুষের কাজ নয়, তুমি কেবল এগিয়ে যাও।'

আমি সেই থেকে এগুতে এগুতে একটা জায়গায় এসে দেখি আর কোনো পথ নেই। এর আগে হাতে ডানে একটা সুড়ঙ্গ মুখ দেখেছিলাম। আমি কিছুটা পিছিয়ে সেই মুখে দাঁড়াই। দেখি, সেখানে একটা আগুনহীন মশাল দেয়ালের খোঁড়লে রাখা। এদিকে আমার এতক্ষণের মশালের আগুনের তেজ কমে গেছে। বুঝতে পারি আমাকে এখন নুতন মশাল জ্বলাতে হবে।

এবং আমি তখন একটা ঘোর থেকে জেগেও উঠি, দেখতে পাই আমি এতক্ষণ যে চলছিলাম আমার গায়ে কোনো কাপড় নেই। আরো টের পেলাম আমার পিঠ জ্বলছে। কোমরের কাছে পাছার চামড়া নখে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। কানের লতিতে, গালে দেওয়া সেই কামড়গুলিও টের পেতে শুরু করলাম এতক্ষণে।

একটা আয়না পেলে ভালো হত। কবে পড়া কার যেন একটা কবিতার মাথার ভেতরে শব্দগুলো সাজিয়ে দিতে থাকে: 'আয়নায় কি দেখা যায় ক্ষত/ কুরক্ষেত্রের রক্ত গায়ে তুমি যুদ্ধে পারনি হতে স্থির/ গায়ে বীরের তকমা/ সেটে গেছে জন্মের পরে/ হিজিবিজি কেটেছ ক্ষীণতোয়া নদীতে/ মন ভরে রেখছে অলীক জোছনায়/ আয়না থেকে সরে গেলেই ক্ষত মুছে যায়/ কেবল অবকাঠামো ভরে যাচ্ছে ক্ষতে আর স্মৃতিতে।' কবে পড়েছিলাম এই লাইনগুলি? কার লাইন এগুলি? একা হাঁটার পথে কেবল কবিতা এসে ভিড় করে। ভিড় তো করে না আসলে একা পথের সঙ্গি হয়ে ওঠে।

বিশ্বাবদ্যালয়ে আমার পাশের ঘরে নকিব নামে একটা ছেলে থাকত। কবিতা লিখত। বলত, 'যত একা তত লেখা।' দেখতে কেবল সুদর্শন ছিল না। সুঠাম শরীরের ঋজুতা কাপড় চোপড় ফুড়ে চোখে পড়ত। বলত, 'শরীর নিজেই একটা গহীন সুড়ঙ্গ। তার বাঁকে বাঁকে রঙ্গ রস। শান্ত থেকে বীভৎস। বাৎসল্য থেকে শৃঙ্গার সবধরনের কিছু পাবে।'

সুড়ঙ্গের ভেতরে আমি চলছি। হাতে মশাল কোথায় যাবো– এ তো অনেক দূরের প্রশ্ন, এখন কোথায় যাচ্ছি– তা-ই তো জানি না।

আমি বুঝতে পারছিলাম না।

'বোঝাবুঝির দরকার নেই এখন কেবল এগিয়ে চল। চলতে চলতে একদিন ঠিকই বুঝে যাবে কোন দিকে যাচ্ছো তুমি।' কেউ ছিল না তবু কার কথা এভাবে বারবার কানে বেজে উঠছিল। নতুন মশালের আলোটাকে কেমন যেন নিজের চোখেই লাগছিল। মাঝে মাঝে হলকা দিয়ে আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল। এতক্ষণ চলছিলাম সেই সুরঙ্গর পথের একটা মৃণতা ছিল। ঠিক গোলাকার টানেলের মতো পথ। কেবল অবিরাম এঁকেবেঁকে গেছে। হঠাৎ করে পথটা অমসৃণ হয়ে গেল। দেয়ালে আর পায়ের নিচে আগাভাঙা কাঁটার মতো পাথর এবড়ো থেবড়ো বেরিয়ে আছে। চলতেও কষ্ট হচ্ছিল। ভাঙাচোরা আর

এবড়োথেবড় হয়ে উঠেছে চলার পথটাও। পায়ে চপ্পলটা কীভাবে পরা ছিল খেয়াল করিনি। নাকি তখন সবকিছু খুলে ফেললেও চপ্পলটা খোলা হয়নি।

হঠাৎ এটা হোঁচট খেয়ে কোনোমতে সামলে নিয়ে দেখি একটা স্ট্রাইপ ছিঁড়ে গেছে। একরকম ঘষটাতে ঘষটাতে সেই চপ্পল পরা পা টাকে নিয়ে চলতে থাকি। এক জায়গা এসে দেখি জায়গাটা কেমন ধোঁয়াটে হয়ে আছে। কিছুই আর স্পষ্ট করে দেখা যাচেছ না। ধোঁয়ার জন্য আমার কাশি আসে। এর ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে আমি এমন একটা গোল-দরজার সমানে এসে দাঁড়াই, দুপাশে মাঝবরাবর কেটে দুভাগ করা দুটো তরমুজের অর্ধেকটা মতো দেখতে দেয়াল ফুলে আছে, যেখানে একটা সিঁড়ি ওপরের দিকে আরেকটা সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। সেই নারীর রহস্যময় পায়ুপথের ভেতরে যেতে আসতে আসতে সপ্তনরক অষ্টস্বর্গে ভেঙে ভেসে যাচ্ছিল এই শরীর। সে বলেছিল, 'গোলদরজায় এসো।' আমি বুঝতে পারিনি। তারপর নিজেই নিয়ে গিয়েছিল তার প্রবেশ মুখে। গোল-দরজারটা দেখে আমার কিছুক্ষণ আগের সেই ঘটনাটা ফের স্মৃতি থেকে শিহরণ নিয়ে আসে। নেশা নেশা ঘোর ঘোর লাগে। নিজের সামলে নিয়ে গোলদরজা দিয়ে ঢুকে দেখি, ওপরের দিকে ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় লেখা 'ওপরে ওঠার সিঁড়ি'। নিচের দিকে নমার সিঁড়িটাতে কিছু লেখা নেই। এতক্ষণের লালাভ দেয়াল আর সুড়ঙ্গ পথ এখানে এসে একেবারে থেমে গেছে। অদ্ভুত ব্যাপার হল, নিচের দিকে যে সিঁড়িটা গেছে তার রঙ শ্বেতপাথরের মতো, আর ওপরের দিকে সিড়িটা ইস্পাতের তৈরি এবং রঙটা একবারে কুচকুচে কালো। ইস্পাতের তৈরি যে তা সিঁড়ির হাতলটা ধরতেই বোঝা গেল। আমি স্বাভাবিকভাবে প্রথমে ওপরে ওঠার সিঁড়ির কথা ভাবলাম কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল করলাম, নিচে নমার সিঁড়িটা দিয়ে আলোময় একটা আভা আসছে অন্যদিকে ওপরে ওঠার সিঁড়িটা অন্ধকার।

আমি ওপরের ওঠার সিঁড়িটাকে বেছে নিলাম। সেখানে পা দেওয়া মাত্র হাজারো পুরুষের পৌশাচিক অট্টহাসি আর নারী খিলখিল হাসির শব্দশোনা গেল। এমন চমকে উঠেছিলাম আরেকটু হলে আমি সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়েই দ্বিতীয় ধাপে পিছলা খেয়ে তাল হারিয়ে ফেলতাম। মনে করেছিলাম আমার পেছনেই এরা সবাই হাসছে। আমি কেন যেন আমার নগ্নতা নিয়ে মোটেও চিন্তিত হলাম না। শরীরের সবকিছুই শরীর। তখন আলাদা করে লজ্জাস্থানটানের কোনো ধারণা আমার আর ছিল না। কিন্তু কারা এরা?

আমি একধাপ করে একধাপ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। অদ্ভুতভাবে আমার মাথার ভেতরে সেই শুরুর দৃশ্যগুলি ত্রিভুজ চতূর্বুজ পঞ্চভুজ হয়ে বিভিন্ন ফ্রেমে কেবল ভেসে উঠতে থাকে। আমি দেখতে পেলাম সেই যুবতী নারীকে, আমি দেখতে পেলাম আমাদের উদ্দামরতিলীলাকে, আমি দেখতে পেলাম আমাকে তার দেয়া মশাল, কথাগুলির বলার সময়ে দৃশ্যগুলিকে।

সবই নিঃশব্দে ভেসে উঠে মিশে যেতে থাকল, আবার ফুটে উঠতে থাকল, আবার মিশে যেত থাকল। সিঁড়ি প্রথম ঢালটার ঠিক মাঝখানে এসে আমার সারা শরীর গুলিয়ে উঠল। মনে হল, আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার পা ডানপাটকে নিচের থেকে শক্ত করে করে কারা যেন ধরে রেখেছে। আমি কিছুতেই ছাড়িয়ে আনতে পারছি না। আমার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। আমি দুহাতে মাথার দুপাশ চেপে ধারলাম নইলে মনে হচ্ছিল মাথার রগ ছিঁড়ে যাবে।

মশালটা ফেলে দিয়েছিলাম। যখন দুহাতে মাথা চেপে রেখে আছি তখন মশালটা গড়িয়ে গড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। এর ভেতরেই মশালটা নিভে গেল আর বোধ করি সঙ্গে সঙ্গে আমি সিঁড়িতে পড়ে গেলাম। যখন উঠলাম দেখি আমি একটা বিশাল ঘরের এক কোণে থাকা একটা খাটে একা শুয়ে আছি। আগের মতোই আমার গায়ে কোনো কাপড় নেই। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল গত রাতে আমি এই বাসায় টোরার সঙ্গে এসছিলাম। কিন্তু টোরা কোথায়? ঠিক তখন বাথরুম থেকে বের হল। বড় একটা তোয়ালেতে বগল বারবার বুক থেকে উরুর মাঝখান পর্যন্ত ঢাকা। ধড়টা ঢেকে আমার দিকে এগিয়ে

আসছে। মাথায় আরেকটা তোয়ালে প্যাচানো। ধরধবে সাদা তোয়ালেটা তার মোমের মতো গোলাপি ওর শরীরটা। আমি দেখছিলাম একটা জীবন্ত বার্বি ডল। টোরার সমস্ত কিছুই নাচ। কথার বলার সময় চোখমুখ হাতে মুহূর্তে নাচের মুদ্রা। আমার খুব নাচ ভালো লাগত। টোরা আমাকে তার সমস্ত নাচের সঙ্গী করে নিয়েছিল। আমার ওই সময়টাকে আনন্দে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিল সে।

২০.

রাজশাহীতে থাকতে আরেকদিন সন্ধ্যার আগে থেকে মানে চাঁদ ওঠার আগে পর্যন্ত পদ্মার পাড়ে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসেছিলাম। সূর্যাস্তের পর থেকে আমি যেন আর নড়তে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল সামনে দৃশ্যগুলি ছাড়া আর কোনো কিছুর ভেতরে আমি যেন নেই। আমি আমার ভেতরেও ছিলাম না। দুকূল ভেসে যাচ্ছে জোছনায়। সমস্ত কিছুর ভেতরে এমন এক প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। পুরো পৃথিবী মুগ্ধপ্রেমিকের মতো চাঁদের দিকে চেয়ে আছে। পদ্মার পানি চাঁদের আলোর ছোঁয়া পেয়ে নেচে নেচে আনন্দ দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছিল, প্রতিটি ঢেউয়ের বেঁকে ওঠার ভেতরে একটা করে চোখ আছে। সেই চোখেও আনন্দে ঝলমল। মনে হচ্ছিল, সমস্ত চরাচর জুড়ে এক রুপালি পোষাকের আবছাভাবে ফুটে ওঠা হাজার হাজার নর্তক-নর্তকী নেচে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম। এমন আমি আর কখনো দেখিনি। নাচতে নাচতে তারা উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে, আবার নেমে আসছে কাছে আসছে, এসেই দূরে চলে যাচ্ছে। আমি টের পাচ্ছিলাম আমার বুক ভেঙে কী একটা বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। আমি আর সহ্য না করতে পেরে দৌড়াতে শুরু করলাম।

বাসা সেখান থেকে আধা মাইলের মতো দূরে। আমি দৌড়াতে দৌড়াতে বুক চেপে ধরলাম। বাড়ির ঢোকার গেটটা ছোঁয়ার আগ পর্যন্ত আমি থামিনি। বাড়ির উঠান পেরিয়েই আমি চলে এলাম আমার ঘরে। বিছানার ওপরে বসলাম। আমি হাঁপচ্ছিলাম একই সঙ্গে মনে হল আমার চোখের সামনে ঘরটা মুছে গিয়ে সেই জোছনা ভেসে যাওয়া পদ্মা আর মেঘের মঞ্চ থেকে নদীর জলজ মঞ্চে কেবল নেচে চলেছে হাজার হাজার নারীপুরুষ। জোছনার মতো রুপালি পোষাক গায়ে তাদের সেই নাচের কোনো বিরাম নেই। মানে আমি যা দেখে এসেছি তেমনই চলছে আমার ঘরের ভেতরে। আমার ঘরের সবকটা দেয়াল সরে গিয়ে আমাকে ঘিরে ফেলেছে অদ্ভুত একটা সময়। আমি ভয় পাবো না খুশি হব নাকি নিশ্চুপভাবে বসে থাকব আমি তাও বুঝতে পারছিলাম না। আমি এমন বিহ্বল এর আগে কোনো দিন বোধ করি নি। আমি হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে ফেললাম। তারপর চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম কিন্তু চোখও বন্ধ করে রাখতে পারছিলাম না।

সন্ধ্যার সময় ঘরে এসেছ কিনা দেখতে আম্মা হ্যারিকেন নিয়ে ঘরে এসে দেখেন আমি শুয়ে আছি আর তিনি যে এলেন তাতে আমি কোনো কোনো কিছু বোধ করলাম না। আমি নিশ্চল মূর্তির মতো বিছানায় পড়ে থাকলাম। আম্মা আমার কোমরের কাছে বসে বললেন, 'এ কী! তুই কাঁদছিস কেন?'

আম্মার কথা শুনে আমি আরো বেশি করে কাঁদতে শুরু করলাম। তিনি আমাকে ওই অবস্থায় জড়িয়ে ধরলেন।

'কীরে কী হয়েছে বল?'

তার ভারী বুক আর শরীরটা কাঁদার মতো আমার শরীরে ওপর গলে যেতে থাকল। আমি যেমন ছিলাম তেমনই পড়ে রইলাম।

তিনি কিছুক্ষণ সেভাবে থেকে উঠে বসে আবার বললেন, 'কীরে কী হয়েছে বলবি তো?'

আমি অস্ফুটে বললাম, 'এত সুন্দর! এত সুন্দর!'

'কী এত সুন্দর?'
'আমি বলতে পারব না আম্মা, আমি বলতে পারব না।'
বলে আমি ফের মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলাম।
আম্মা বললেন, 'কী হয়েছে কী হয়েছে'– বলে একেবারে হন্যে হয়ে উঠলেন, আমি নিজকে তখন একটু শান্ত করে আনতে পারলাম। কান্নার জন্য নাকি কীসের জন্য আমি জানি না, আমি তারপর বলতে গেলে একটা একটা শব্দে ভেঙে ভেঙে করে তাকে পদ্মা নদীরে পারে বসে থাকা, সূর্যাস্ত দেখা, চাঁদ ওঠা, চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া চারদিকের ভেতরে হাজারো অবছায়া মানুষ রুপালি পোষাক পরে নেচে চলেছে আমি কেবল দেখে যাচ্ছিলাম, তারপর আমি দৌড়াতে দৌড়াতে বাসায় ফিরে আসি। তারপরও আমি দৃশ্যগুলি দেখে যেতে থাকি বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি আসার আগ পর্যন্ত আমি তাই দেখে যাচ্ছিলাম।
'আম্মা আমি আসলে বলতে পারব না, আমি আর কিছুই বলতে পারব না, কেন আমার কান্না আসছে।'
আম্মা বললেন, 'আমি বুঝেছি বলতে না পারার জন্যই তুই কাঁদছিস। কান্না দিয়েই যা বলার তুই বলেছিস। এত নরম তোর মন। পাগল।'
আম্মা আর কিছু না বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে রইলেন।
আমি আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে উঠলাম। আমার ঠিক এমনটাই লেগেছিল বীণা আন্টির বাসার ছাদে একটা জোছনা রাতে, এর কিছুক্ষণ আগে আমি জীবনের একটা অদ্ভুত জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। কেমন একটা অনুভূতি যে হচ্ছিল যে কোথাও গিয়ে প্রাণ খুলে কাঁদতে পারলে আমি সুখ পেতাম। তিনি যখন বাথরুমে গোসল করছেন আমি সে সময় বিছানায় উদোম পড়ে আছি। হঠাৎ মনে হল, আমার সবকিছু যেন ডাকাতি হয়ে গেছে। নিজের কাছে ধরে রাখার মতো আর কিছুই নেই। একটা খা খা করা শূন্যতা আমাকে ঘিরে ধরেছিল। কোনো অসহ্য সুখের পরপরই এমন ফাঁকা শূন্য মনে যে হয় আমি বহুবার দেখেছি। অন্তত এমন একটা সুখের পর নিজেকে এমন নিঃস্ব লাগে মনে হয় আবার নতুন করে সব শুরু করতে হবে। কখনো মনে হয়, আগের সমস্ত ক্লান্তি গ্লানি থেকে এমন মুক্ত হয়েছি যে আর মনে আর কোনো ভার নেই। আর কোনে দুশ্চিন্তা নেই। এমনকি কোনো চিন্তাও যেন নেই। ঠিক এমন শূন্যতা আর রিক্ততার ভেতরে আমি এত বিহ্বল হয়ে যাই যে কিছু না করতে পেরে কেঁদে ফেলি।
এমন যে কবার হয়েছে আমি কান্না ছাড়া আর কোনো কিছু দিয়ে তা সামাল দিতে পারিনি। সেদিন ছাদের ওপর চাঁদের দিকে তাকিয়ে আমি দেখি পূর্ণ চাঁদের ভেতর থেকে চরকাকাটা বুড়ি সরে গেছে। রেখে গেছে তার চরকা থেকে তৈরি সুতা দিয়ে চাদর যে চাদরের প্রান্তে আমার শরীরের সার নির্যাস রয়ে গেছে, যে চাদরের সমস্ত মসৃণতা পবিত্রতা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে উৎসারিত কামনাতরলে একটা মাংসময় যুদ্ধের ইতি টেনে দেওয়া হয়েছে এমন হাজারো যুদ্ধ শুরু করার জন্য। এর শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। প্রেম এবং যুদ্ধ, প্রেম বনাম যুদ্ধ। কৃষ্ণ বনাম বুদ্ধ। যে কোনো দুটোর একটা বেছে নেওয়ার আছে– এরাই বাদবাকি সব কিছুর উৎস। সম্ভাবমি যুগে যুগে। লীলা অথবা নির্বাণ।
আমি বোবামানুষের মতো এসব কী হচ্ছে সেই পনেরো বছর বয়সে কিছুই আসলে বুঝতে পারিনি। একটা খেলায় নিজের অজান্তে নেমে পড়েছিলাম, খেলতে খেলতে তৎক্ষণাৎ জেনে গিয়েছিলাম এর কিছু নিয়ম কানুন। তারপর নিজেও প্রতিপক্ষকে চাপের মুখে রেখে নিজের হাতে খেলার কর্তৃত্বটা নিয়ে নিয়েছিলাম। তারপর তো চলে গিয়েছিলাম ফের প্রতিপক্ষের হাতে। কিন্তু টোরার ক্ষেত্রে আমি টোরার খেলাই কেবল দেখেছিলাম। মাঠ দেখছিল তার খেলাকে। মাঠ জানে কতটা কী হয়। যার কিছুই সে জানত না সেই প্রথম খেলার দিন। তার স্তন ছানতে ছানতে বীণা আন্টিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কী বড় বড় দুধ! এবয়সেও এগুলো টাইটগুলো থাকল কীভাবে?' কী হাসি যে হেসেছিলেন শুনে। বললেন, 'আমার যখন প্রথম মিনস হয়, তার আগে আগে আমি একবার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের পাশের বাড়িতে হরিহর কবিরাজের বউ আমাকে নিজের থেকে বলেছিল, যে আমার শিগগিরই কোনো

দিন এমন করে রক্ত বের হবে। আমি যে সেই রক্ত একফোঁটা মাটিতে না পড়তে দেই। আমিও তাই করেছিলাম। আর ঠিক এমন সময় রক্ত বের হয়েছিল যে সময়টায় আমি ছিলাম তার বাড়ির উঠানের একেবারে কাছে হাতের ধরে রেখেছিলাম রক্ত। মাসি মাসি বলে চিৎকার দিতেই তিনি এসে আমাকে একেবারে উঠানের ভেতরে ন্যাংটা করে ফেলেন। তারপর রক্তে ভেজা আমারই সেই হাত আমার বুকের মাখাতে লাগলেন। নিজেও মাখিয়ে দিলেন কিছু। এটা করলে বলে চিরদিন টাইট থাকে। আমি অবশ্য বিশেষ যত্ন নেই। কিছু ব্যায়াম করি। তো ওটা ছিল কবিরাজি পদ্ধতি। প্রথম ঋতুর রক্ত স্তনে মাখানো হলে চুঁচি চিরদিনে জন্য খাড়া থাকে।। উঠান ভরা দুপুরের রোদ। তার ভেতরে আমি উদোম দাঁড়িয়ে। আকাশের চোখ ছাড়া আর কেউ দেখার ছিল না এই দৃশ্য। পুরোবাড়ি ফাঁকা। আশেপাশের বাড়িগুলিই বেশ দূরে দূরে। তার বাড়িতেও বহুদিন ধরে মানুষ বলতে দুজন। হারিহর কবিরাজের একটাই ছেলে মধুসূদন। চলে গেছে নিরুদ্দেশ। তবে বলেছে সে রাজা হয়ে ফিরবে নইলে আর ফিরবে না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন ঠিকানা থেকে চিঠি আসে কোনোটা ইটালি কোনোটা ডেনমার্ক কোনো ফিনল্যান্ড আবার কখনো মরক্কো কখনো তিউনিসিয়া। আর আসে টাকা। অন্যদিকে ফাঁকা বাড়িতে দুজনে একা। হরিহর প্রথম জীবনে তেমন কিছু করতে পারে নি কিন্তু এখন বিরাট সম্পত্তি করে ফেলেছে। হরিহরের বউ পঞ্চাশ বছর বয়সের তাড়গা জোয়ান মহিলা। বলত, আছাড় দিয়ে নিজেই আস্ত একটা ষাড় মাটিতে ফেলে দিতে পারবে। হরিহরের বয়স ছিল সত্তরের মতো। মাথার একটা চুলও পাকেনি। চামড়ায় কোনো ভাঁজ পড়ে নি। দাঁতে এখনো বাঘের জোর। কব্জিতেও। আর এই বয়সেও বলে বাড়ির পেছনে বেড়া দিয়ে ঘেরা পুকুর পাড়ে দু বুড়োবুড়িতে গভীর রাত থেকে ভোর অবধি জলকেলি করে। বুড়োর কোমরে কী জোর! বলি, এত জোর দিয়ে আর কী হল, মধুই প্রথম মধুই শেষ। কিন্তু তুমি জেনে আশ্চর্য হবে ঠিক পঞ্চাশ পার হওয়ার পর মহিলা ফের গর্ভবতী হল। আর তাও কি যমজ বাচ্চা একটা ছেলে একটা মেয়ে। আর ছেলেটা পরে নামকরা আর্কিটেক্ট হয় আর মেয়েটা চলে যায় কানাডায়। তাদের মতো মেধাবী ছেলেমেয়ে আশে পাশে আর কেউ ছিল না। বেশি বয়সের সন্তান তো পেটের ভিতরেই এমএ পাশ দিয়ে বের হইছে, ওগো লগে পারব কে? লোকজন এভাবেই বলত। গল্পটা বিশ্বাস হল?'

'না।'

২১.

আমি একটা সময় টের পেলাম আমার জগতটা কেমন একটা দুমুখো বোতলের মতো। দুমুখেই ছিপি আঁটকানো। বোতলটা কালো। এর ভেতর থেকে বাইরের কিছু দেখা যায় না, বাইরের থেকে ভেতরের কিছু দেখা যায় না। আমি একটা মুখে আমার পড়ালেখা করে ফিরে যাই আরেকটা মুখে, যেখানে বীণা আন্টির আগ্রাসী ঠোঁট আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। প্রথম বর্ষ থেকে অনেকে ধরে নিয়েছিল, আমি সাংঘাতিক ভালো কোনো ফল করব। আমি অবশ্য সেরকম কিছু ভাবতাম না।

নিজের কাজগুলি কখন কী কারণে করা হয়, বা কেন করা হয় না– এসব ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন বিষয় নয়। আবার মনে হয় পুরো ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু নিজের কার্যকারণের অনেক কিছুই সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। লন্ডনে আসার পর আমি বুঝতে পারি, যে আমি যা চাই না তা না-চাইতেও আমি কতটা করতে পারি, করে মজাও পেতে পারি। কাজ করে মজা পাওয়া ব্যাপারটা হল বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে দরকারি বিষয়গুলির একটা। আমি মজা পেতাম নতুন জায়গা আর নতুন মানুষজন দেখে। নতুন নতুন সকাল। কখনো মেঘলা আকাশ কখনো রোদের ঝলমল নীল আমার মনে এমন একটা ফূর্তি আনত যেন ডানা থাকলে পাখি হয়ে যেতাম। সবচেয়ে ভালো লাগত গ্রামের দিকগুলি।

এখানে আসার আগে ড্রাইভিং শিখে এসেছিলাম। বিদেশে গেলে একটা জিনিস যদি কাজে দেয় সেটা হল গাড়ি চালানো। অথচ আগে মোটার কার সত্যিই কেমন খটকা নিয়ে আসত। মনে হত, এ এক আজব জিনিস এর সঙ্গে আর কারো সম্পর্ক তৈরি হোক বা না হোক আমার কোনো সম্পর্ক তৈরি হবে না। কিন্তু পরে মোটর কার ছাড়া নিজেকে ভাবতে পারতাম না। কিন্তু আমি হাঁটতেও পছন্দ করি। প্রচুর হাঁটতাম। বা হাঁটি। কিন্তু সারাদিন পর ঘরে ফিরে এলে আর্মচেয়ারে বসে থাকার সময় একটা চিন্তা আমাকে পেয়ে বসত, এখনো কোনো কিছু ঠিক কেন করতে পারছি না। একজন মেয়েমানুষ আমার কি দরকার? কেন দরকার সে আমি তো অনেক শুয়েছি। অন্য কোনো দরকার আছে। শোয়াটা বরং পরের কথা। আমি ঘরে ফিরে কাউকে দেখব না। ছোটবেলায় ঘরে ফিরে মায়ের হাতে রান্না সুজি বা কোনো মিষ্টি বা পিঠা, দু একটা আদর মাখানো কথা। কখনো আমার সঙ্গে ভান করে রাগ করা। কখনো আমাকে ক্ষ্যাপানোর জন্য কোনো কথা বলা। এসব মনে হলে, মনে হত– আমি বিরাট একটা জিনিস আসলে পাচ্ছি না। আমি বঞ্চিত রেখেছি নিজেকেই। একা হতে চাওয়ার ইচ্ছা নিয়েই ইউকে-তে আসা কিন্তু দোকা হওয়ার জন্য ভেতরে ভেতরে কে যেন ওৎ পেতে আছে। টোরার সঙ্গে যদি থাকি আমি চোখ বন্ধ করলেই বীণা আন্টিকে দশ আঙুলে পেয়ে যাই। কিন্তু একটা মানুষের ভেতরে আরেকটা মানুষের স্বাদ পাওয়া যায় না। টোরা আমাকে আরো অনেককিছু পাইয়ে দিয়েছে যা আর কারো সঙ্গেই পাব বলে মনে হয় না। সেখান থেকেই আমি টোরাকে শেষ পর্যন্ত আর দূরে সরিয়ে দিতে পারি না। জীবনে অনেক কাণ্ড করেছে সে। বলত, কিছু না হলে ইসরাইলে চলে যাবে। খেয়াল খুশি মতো যখন যেখানে ইচ্ছা হয়েছে চলে গেছে। যতদিন ইচ্ছা হয়নি ফিরতে ততদিন আর ফিরে নি।

'তুমি কি হিপিটিপি মতো জীবন চেয়েছিলে?'

'জানি না। যেমন কখনো মনে হয়নি আমার ভালোবাসার খুব অভাব। খুব ছোটবেলায় আমার মা মারা যায়। আমার বাবাকে আমি কখনো দেখিনি। এই নিয়ে আমার ভেতরে কোনো আবেগ ছিল না বলেই মনে করতাম কিন্তু একটা বয়সে এসে যখন থেকে আমি বুঝতে শুরু করলাম আমার শরীর জেগে উঠেছে আমি পুরুষদের পছন্দ করতে শুরু করলাম। কিন্তু আমি যতটা পছন্দ করি তার চেয়ে তারা আমার প্রতি বেশি আগ্রহ দেখায় এর কারণটা খুব সহজ। প্রথমত আমার লম্বাসিল্কি চুল, দ্বিতীয়ত আমার ভরাট বুক আর তৃতীয়ত আমার সাঁটানো পাছা। তারপর আমি বলে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে হাঁটি।'

আমিও খেয়াল করেছি ও কেমন যেন পাছা উঁচিয়ে হাঁটে। আর ওর শরীরের ওপরের অংশ হাঁটার সময় এগিয়ে থাকে। আর পেছনের অংশ যেন ভারের ঠেলায় তুলে নেওয়া কষ্টকর। ওর ওপরের অংশ, মানে কোমর থেকে ওপরের দিকটা, পেছনের অংশটাকে টেনে নিয়ে চলে। আর হাঁটার সময় ওর পুরো শরীর ডানে বামে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে দোলে। হাঁটা ঢেউ হয়ে ওঠে। এমন মসৃণ সেই শরীরতরঙ্গ ভালো মতো খেয়াল করলে তবে বোঝা যাবে না । ওর হাঁটার ভঙ্গি শরীরের গড়নের সঙ্গে মিলিয়ে একটা ভারসাম্য তৈরি করেছে। আমি অবশ্য নিজেই এটা প্রথমে খেয়াল করিনি। ও-ই আমাকে নিজের হাঁটা দেখিয়ে বলেছে, 'আমার হাঁটাটা কেমন?' আমি বলেছিলাম, 'সো সেক্সি'। শুনে খুব খুশি হয়েছিল টোরা। টোরা আমাকে কেমন যেন উদাসীনও করে দিয়েছিল। ওকে খুব ভালো মতো খেয়াল করাও হত না। কিন্তু সে সবসময় আমাকে খুব ভালোমতো করে খেয়াল করত।

বীণা আন্টি বলত, 'মানুষের অনেক আদিম ব্যাপার থাকে। ভুলে যাও কেন মানুষ একদিন পশু ছিল। বাইরে থেকে কে বুঝতে পারে মানুষ কী করতে পারে। আর কী করতে পারে না। মানুষের পুরো ব্যাপারটাই ভেতরের ব্যাপার। তুমি দেখ না মানুষের সব কিছুই মানুষের থেকে বড়। অন্তত যেগুলি দিয়ে সে নুতন সভ্যতাকে বানিয়েছে। একটা রেলগাড়ি চিন্তা করা যায়– এইটুকু মানুষেরই কিন্তু তৈরি। একটা মোটরগাড়ি বা সমুদ্রজাহাজ তার তুলনায় মানুষ কী, কিছু না। একটা ছোটখাটো গাছ কিন্তু মানুষের চেয়ে

বড়। মানুষ ব্যাপারটাই ভেতরের ব্যাপার। বাইরের চেহারা উচ্চতা ওজন দিয়ে তার কিছুই আসলে মাপা যায় না। যারা ভেতরের গুণে মানুষ তারাই আসলে মানুষ।'
আমি জিজ্ঞাসা করি, 'আমি কেমন মানুষ?'
'তুমি আছো আর কী; চলে।'
বীণা আন্টি এমন ভাবে বললেন, যে তাতে কেমন একটা ঠাট্টা মেশানো রইল।
আমি হেসে বলি, 'কী চলে?'
'কাজ চলে।'
'কতটুকু কাজ চলে?'
'ভালোই চলে।'
'না মানে আমার দ্বারা কিছু করা সম্ভব কি না?'
'দেখ কী করা সম্ভব– তা তোমার বাস্তবের ওপর ভিত্তি করে বলতে হয়। কী করা সম্ভব ঠিক করে তুমি বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নেবে, নাকি বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নিয়ে সম্ভবের দিকে এগিয়ে যাবে– তুমি যেভাবে মনে কর। আমি তো মনে করি সম্ভব অসম্ভব যা-ই হোক না কেন মানুষকে বাস্তব থেকেই সম্ভবের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। আমার কথা না রুশোর কথা। এটাকে তুমি যেকোনো দিক থেকেই নিতে পারো।'
আমি বলি, 'আপনি তো কত কিছু জানেন পড়েন কিন্তু, আপনার কি ধারণা মানুষ এসব কিছু একটার জন্য করে বা কেন করে, করেই বা কী লাভ?'
'মানে বুঝলাম না?'
'মানে মানুষ এসেছে ত্রিশলক্ষ বছর আগে, ছয়শো কোটি বছর না কত যেন পৃথিবীর বয়স– কিন্তু ইতিহাস তো মাত্র সাত কি আটহাজার বছরের তো একজন মানুষকে আসলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকলে কী করা লাগে। কারণ কোনো কাজই তো হাজার হাজার বছর সাসাটেইন করার মতো নয়, আর এখন তো কেবল মোডিফাই করার যুগ। আমি বলছিলাম যে আসলে আমাদের কীভাবে বাঁচা উচিত?'
'আনন্দ নিয়ে। তুমি নিজেকে কষ্ট দিয়েও যদি আনন্দ পাও তাহলে সেই আনন্দ নিয়েই মানুষের বাঁচা উচিত। তবে এটার এতবেশি রকমফের যে তুমি আসলে বলতে পারো না, আমি এভাবে চলছি তো সবাইকে এভাবে চলতে হবে। এখানটাতে কিন্তু তোমার সঙ্গে কারো মিলবে না। লোকে বলে, জীবন দুঃখময়। আমি মানি কিন্তু দুঃখটা শেকড় মাত্র, বাদববাকি তার আনন্দ দিয়েই তৈরি। হ্যা, একটা লোক অনেক কিছু পেল– তারপর সে একদিন ভেবে দেখল সে যখন এত কিছু পেয়েছে, তার বাবা-মা এর কিছু দেখে যেতে পারল না, দেখল তার অর্থবিত্ত খ্যাতির কোনো সীমা নেই কিন্তু নিজের একমাত্র বোনটা প্রতিবন্ধী হয়ে আছে। এটা কেবল একটা মানুষের জীবন না পৃথিবীতে হাজারো মানুষের জীবনে এমন ঘটেছে বা ঘটছে। গৌতম বলেছিলেন না, এমন একটা বাড়ি খুঁজে বরে কর আর সেখানে থেবে একদানা সর্ষে এনে দেও যে বাড়িতে মৃত্যু স্পর্শ করে নি। তখন বাড়ির পর বাড়ি গিয়ে সন্তানহারা মা দেখল তার মতো মৃত্যুর শোক আগে পরে প্রতিটি মানুষের জীবনে আছে। সে যখন এই বেদনাটিকে অন্যদের জীবনের নিত্যতা হিসেবে দেখল, তখন তার শোকও কমে আসতে থাকল, বুঝল, মৃত্যু একবারেই স্বাভাবিক ঘটনা। পৃথিবীতে খুব কম জিনিস থাকে যা একইসঙ্গে বাস্তব আর সত্য। তার ভেতরে মৃত্যু একটা। তুমি দেখবে তোমার যৌনতাটা তোমার কাছে বাস্তব, কিন্তু সত্য হল তোমার প্রেম। আবার প্রেমটা বাস্তব কিন্তু তোমার কাছে সত্য হল সেক্স। এমন উলটা-পালটা অছে জীবনের কম বেশি সব কিছুতে। এমনকি জন্মকে তুমি মিথ্যা ভাবতে পার, ভুল ভাবতে পারো। তুমি অন্যের জন্মকে ঠেকিয়ে রাখতে পারো। কিন্তু মৃত্যুকে তুমি কোনো ভাবে আটকাতে পারো না। রোগশোক, ক্ষয়, দুঃখ, বেদনা এমনি যা যা আছে সবকিছু একেবারে বাস্তব এবং সত্যে মেশানো– কিন্তু আনন্দটা কিন্তু তা নয়, এটা

এমনি এমনি আসে না। এটাকে তৈরি করতে হয়। বানিয়ে নিতে হয়। তোমার জন্ম দুঃখ থেকে কিন্তু তোমাকে ফলাতে হবে আনন্দ।'

আমি বলি, 'দুঃখ চাষ করে ফলাতে হবে আনন্দের ফসল? ভালোই তো কবিতা হল।'

'হ্যা, কারণ দুঃখটা মৌলিক আর আনন্দটা যৌগিক। দুঃখটা একার, কিন্তু আনন্দটা সবার। সেটার ভাগ হয়। দুঃখের কোনো ভাগ হয় না। এজন্য দুঃখটা দুঃখ। দুঃখটা শেকড়, আনন্দটা তার ডালপালা ফুলফল। আবার ফল থেকে যেমন বীজ, তেমনি আনন্দটা দ্রুত মরে গিয়ে ফের দুঃখ হয়ে ওঠে, আনন্দটাই বেদনার বীজ তৈরি করে। আমরা যে বলি এটা একটা চক্রকার ঘটনা– এটা একারণেই। তুমি তো জানো আমার কাছে আনন্দ মানে যৌনান্দ। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টাই আমি এর ভেতরে ডুবে থাকি। কিন্তু আমি তো তা থাকি না। আমাকে আরো অনেক কাজ করতে হয়। একটা পর্ব পর্যন্ত এটা থাকে, তারপর বেমালুম গায়েব হয়ে যায়। মাসের ভেতরে এক সপ্তাহের কি দুমাসের পর একসপ্তাহের একটা পর্ব আসে যখন অবিরাম এর ভেতরে ডুবে থাকতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তা-ই যে সব সময় নিয়ম বেঁধে হবে তাও কিন্তু আসে না। যেমন তোমার মা যখন তোমাকে নিয়ে আমার কাছে এলেন তখন আমার ঠিক সেই পর্ব চলছিল। নইলে তোমার সঙ্গে আমার কিছু ঘটত না। তোমাকে রেখে দিতে চাইতাম না। আমার সত্তা আত্মা সব দখল করে নিয়েছিল সেই ক্ষুধা।

'তোমার মা সেই তিনটা দিন রাত ভোর করে নিজের গল্প আর গুলশান খানের গল্প বলেছে। বলেছে, সুবক্তগিনকে সে পছন্দ করেছিল, কিন্তু প্রেমে পড়া বলতে যা বোঝায় তেমন প্রেমে সে কখনোই কারো পড়েনি। আর আর্মিরা ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে একটা ঘরে আটকে রেখেছিল কিছু দিন। তার কথা ছিল যখন নিশ্চিত ভাবেই সে ধর্ষিত হতে যাচ্ছে তখন তা থেকেও সে মজা লুটে নেবে। কালন তোমার মায়ের নায়িকা হতে এসে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। একের পর এক পুরুষ বদল তার কাছে নতুন কিছু না। জানো তো মেয়েদের তিনটা রাগমোচনের পর্ব থাকে। পুরুষের থাকে একটা। তা-ই কোনো মেয়ে যদি ওই তিনটা পর্ব পার হওয়ার আগে পুরুষটিকে নেতিয়ে পড়তে দেখে তখন সঙ্গে সঙ্গে তার আরেকটি পুরুষের দরকার হয়। এজন্যই মেয়েরা সহজে তৃপ্ত হয় না। ওই অভিজ্ঞতাটাও বলে তার হয়েছিল। কিন্তু হওয়ার সময় সে ওটা বুঝতে পারেনি। আমি প্রশ্ন করে এটা জেনে ছিলাম। তারপর লোয়ার র‍্যাঙ্কের অফিসারদের থেকে একরকম ছিনিয়ে নেন ব্রিগেডিয়ার গুলশান খান। যুদ্ধের নয়টা মাস একেবারে নিজের কাছে সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। লোকজনকে বলেছেন, তিনি কোহিনুরকে বিয়ে করেছেন। নয়টা মাস বাইরের কোনো রোদ হওয়া গায়ে না লাগলেও প্রচুর চর্বচুষ্যলেহ্যপেয় নিয়ে নধর করে তুলেছিলেন তাকে। একটা গল্প আছে না কোন ডাইনি বুড়ি বালক পেলে প্রথমে তাকে ভালো করে খাইয়ে দায়িয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে পরে তাকে মজা করে খায়– গুলশান খান কোহিনুরকে সেভাবে কিছু একটা করতে চেয়েছিল। কিন্তু টের পেল তার মধুর ব্যবহারে সে এবং তিনি দুজনের প্রেমে পড়ে যাচ্ছেন। এবং শেষ পর্যন্ত প্রেমে পড়ে গেলেন। গুলশান খান বলেছিলেন, কোহিনুর না চাইলে কোনো দিন তিনি তার ধারে কাছে ঘেষবেন না। এজন্য তিনি নিজে যে ফার্লটার্লট করছেন তাও না। কিন্তু কোহিনুর টের পেল রাতে দেরি করে ফিরলে তার ভালো লাগে না। বেলুচ ব্রিগেডিয়ার অন্য সবার চেয়ে আলাদা, তার বন্ধুরা তাকে বলতে তোমার রোমান্টিক স্বাভাবের জন্য তুমি পিছিয়ে পড়লে। এতদিনে তার মেজর জেনারেল হওয়ার কথা। কোর্সমেটদের অনেকেই তা-ই হয়েছিল। পঞ্চাশে কাছাকাছি বয়স হয়েছিল গুলশানের। বিপত্নীক ছিলেন দীর্ঘদিন। আগের স্ত্রীর সমস্ত কিছু রেখে দিয়েছিলেন। সেই স্ত্রীদের বাড়ি ছিল দিল্লি। কোহিনূরকে যখন সেই রুম থেকে বের করে অন্য একটা ব্যারাকে ধরে নিয়ে যেতে টানা হেচড়া করছিল কয়েকজন ক্যাপ্টেন তখন জিপ নিয়ে পার হচ্ছিলেন, এমন চমকে উঠেছিলেন যে তার নহর বানুকে ফের জীবন পেয়ে ফিরে এসেছে। পৃথিবীতে একই না হলেও কাছাকাছি চেহারার বলে সাত আটটি মানুষ বিভিন্ন দেশে থাকে। কোহিনূর ডুপ্লিকেইট কপি না হলেও গুলশানের কাছে আরেকটা নহর বানুর হয়ে এসেছিল। তিনি

তাকে গাড়িতে তুলে নিজের ডর্মেটরিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে বলেছিলেন, কাপড় খুলে ফেলতে। এমন ঠাণ্ডা আর সম্মোহনী কণ্ঠ ছিল, বলেছিলেন, যদি তার এই আদেশ শোনে তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না যদি না শোনে তাহলে, বুঝতেই পারছো, তাও কোহিনূর বলে তাকে মেরে ফেললেও সে একাজ করবে না। তারপর বলে সে শুধু একবারের জন্য তাকে নগ্ন দেখতে চায়। তারপর আর কখনো সে এমন করবে না। অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ একটা ঘরের ভিতরে। গুলশান খান স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে, কোহিনূর তার দিকে চেয়ে। ঠিক জেদি না কিন্তু কিছু একটা দেখার তীব্র আকুতি তার ছিল এবং গুলশান একটু একটু করে মনে ক্ষেপে উঠতে যাচ্ছিল, পরে সে শুনেছে আর একটা মিনিট দেরি করলে তাকে গুলি করে মেরে ফেলতেন। কিন্তু হঠাৎ করে খোসা ছাড়ানো মতো শরীর থেকে সব কাপড় ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে কোহিনুর। গুলশান বলেছিলেন, নগ্নতা যে কত বড় অহংকার হয়ে উঠতে পারে সেদিন আরেক দফা বুঝেছিলেন। যার সামনে এক ব্যাটালিয়ার সৈন্যর মার্চ পাস্ট থেমে যেতে পারে। তাদের কমান্ডারকে উপক্ষো করে সবাই থেমে যেতে পারে একটি অপূর্ব নগ্ন দেহবল্লরীর সমানে। গুলশান খানে একটা রিভলবারের গুলি তো কোন ছার।

তারপর কিছু না বলে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। ফিরি এসছিলেন রাজ্যের বাজার সদাই নিয়ে। আর ফলমূল, মিষ্টি নিয়ে। তারপর শুরু হয় গুলশান খানের সঙ্গে আজব একটা সংসার জীবন। একই ঘরের বিছানায় কোহিনূর আর সোফায় রাত কাটাচ্ছে গুলশান। দুই একটা কথা ছাড়া কোনো কথা বলছে না। দিনে দিনে যা হয়। প্রেম হয় তারপর তো তারপর। কিন্তু এদিকে যা হয়েছে দেশ স্বাধীন হল। গুলশান খান চলে গেল পাকিস্তান। গুলশান খান বলেছিল তার স্ত্রীর সঙ্গে সে দশ বছর সংসার করেছে। কোনো বাচ্চা কাচ্চা হয়নি। কিন্তু এটা তো তার দোষও হতে পার তো। আমার দোষও তো হতে পারে। তাহলে, এর কোনো মীমাংসা আমরা করতে চাইনি। কারণ? কারণ যদি ডাক্তারি পরীক্ষা করে দেখা গেল আমার দোষ, তো তারপর কী করতে হবে। বা দেখো গেল তার দোষ তো? আমরা এর ভেতরে যেতে চাইনি। সুতরাং চিন্তার কোনো কারণ নেই। এবং প্রায় ছয়মাসের সম্পর্কে কোনো দিন বোঝা যায়নি যে তার প্রতি মমত্বের কোনো অভাব আছে। এমন কি যাওয়ার সময়ও নিয়ে যেতে চেয়েছিল। গুলশান খান অদ্ভুতভাবে বাঙালিদের ওপর এই নিপীড়নের পক্ষে ছিলেন না। তার অধীনস্থরা তাকে বলত, স্যার, আপনার ভেতরে এত মায়া! এত মায়া নিয়ে তো আপনি কীভাবে আর্মিতে কাজ করবেন? গুলশান খান বলতেন, আর্মি মানে কী নির্মম কোনো দল? আমরা দেশকে ভালোবাসি তা কি মায়া নয়? গুলশান খান অদ্ভুত লোক, বলেছিল, নিজে কোনো ধর্ম মানত না। বলত, মানুষের আবার ধর্ম কী। মানুষ মানুষের মতো। পশু যা নেই তাই হল মানুষের ধর্ম। যা কিছু পাশুবিক নয়, তাই মানবিক। তোমার মা তো মুগ্ধ হয়েছিল তার কথায়। আর ফিজিক্যাল রিলেশনে। গুলশান বলেছিল, আগের স্ত্রীকে সে ভালোবাসত। একেবারে ননীর পুতুলের মতো আদরকাড়া মেয়ে নাকি ছিল সে। এত নরম স্বাভাবের ছিল। কিন্তু সেক্স বলতে যা বোঝায় তা কখনো পায়নি। তার সঙ্গে সেক্স করতে যে তার কখনো খারাপ লেগেছে তাও নয়। বিয়ের এত বছরেও সবদিকে তার থেকে আঁটো ভাবটা অটুট ছিল। তার স্পর্শও সে পছন্দ করত। কিন্তু হাউ টু ডিল অ্যা ম্যান ইন নাইটটাইম ওন বেড সি ডিড নট নো। বাট কোহিনুর নোওজ। কিন্তু কোহিনুর কোথা থেকে শিখলো। এটা আসলে শেখার ব্যাপার নয়। এটাও ভেতরে থাকে। সবাই চাইলেই সেন্সুয়াল হতে পারে না। এটাও এক ধরনের প্রতিভা। থাকলে সেটা বের হবেই। আলো নিজেই জ্বলে আলোটা তার ভেতরে থাকে আবার সেটা অন্যরাও দেখে।' এ পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেকে বীণা আন্টি বললেন,' তুমি মনে হয় না তোমার মায়ের কথাগুলি ঠিক মতো মেনে নিতে পারছ না?'

আমি বলি, 'আমি জানতে চাইছি বলেই তো আপানি বলছেন।' ঠিক করেছিলাম, আমি এর আদ্যোপান্ত জানতে চাইব। আমি অনেক দিন থেকেই ভেবেছি আমার জন্মের দিনক্ষণ সময়, সবকিছু সম্পর্কে আমি

পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে নেব। আমার জন্ম তারিখ উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর এটা আমি বিশ্বাস করি না।

২৩.

আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না, আমি আসলে কার জন্য, ঠিক কীসের জন্য বাঁচব। আমি এদেশে থাকার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি আমার জন্য জীবনটাকে কঠিন আরো কঠিন করে তুলতে চাইছিলাম। জীবন তো এমনিতেই কঠিন। সে সঙ্গে আনন্দটাও পেতে চাইছিলাম। এর জন্য যে উদার মুক্ত পরিবেশ চাই যেভাবে যে-অর্থে চাই আর চাই পড়ার, ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা আমি সেটা পাচ্ছিলাম না। সবচেয়ে বেশি যেটা চাই হালনাগাদ থাকতে। মামা বলতেন, 'আপডেইটেড থাকাই হল আধুনিকতার একটা শর্ত।' আর সে জন্য আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে থাকার জন্য লন্ডনকেই আমার নিজের জায়গা বলে মনে হল। আসলে মনে হয় বাঙালির যৌথ-অবচেতনে লন্ডন বিলেত এমন ভাবে গাঁথা যে বিদেশ বলতেই বিলেত বোঝা হয়।

আচ্ছা বিলেত কেন বলা হয়? কেউ বলতে পারবে? আমি কিন্তু তা জানি না। আমার অত জানাজানির সময়ও ছিল না। আমি একটা হিসেব কষছিলাম। আর সিদ্ধান্তটা চূড়ান্ত হল একদিন সকালে টয়লেটে বসে। টয়লেটই হল একমাত্র জায়গায় যেখানে মানুষ একবারে একা কিন্তু সজাগ। ঘুমের সময়ও সে একা কিন্তু সজাগ নয়। অন্তত নিজের মতো চিন্তা করার মতো সজাগ নয়। কার কাছে জানি শুনেছিলাম, পৃথিবী পালটে দেওয়ার মতো অনেক সিদ্ধান্ত অনেক যুদ্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নাকি এখানে বসেই নেওয়া হয়েছিল। স্বয়ং হিটলারও বলে তা-ই নিয়েছিলেন। আসলে সবকিছু ঝেড়েঝুড়ে না ভাবলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

লন্ডনের যাওয়ার ব্যাপারটা আমি অনেকদিন ধরে ভাবলেও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। কেন যাব? কীভাবে যাব? দ্বিধা অবশ্য ছিল না, কিন্তু চূড়ান্ত কিছু ভেবে নিতে পারছিলাম না। কাগজপত্র তৈরি করতে হবে। সেটাই মূল ব্যাপার। বাদবাকি কেবল ভিসা পাওয়া আর যাওয়া। এটা কেবল ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যাপার, হ্যা বা না এর ব্যাপার। এর মাঝামাঝি কিছু না। আর যেকোনো কাজে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার ব্যাপারও আছে। আমি আসলে টের পাচ্ছিলাম আমার ভেতরে একটা অস্বস্তি বেড়ে উঠতে উঠতে এর চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আমি আরো টের পাচিছলাম, আমি এমন একটা একাকিত্ব চাইছিলাম যেখানে আমি নতুন কিন্তু আমার আর কোনো সঙ্গের অভাব হবে না। আর এর জন্য বিদেশ ছাড়া আর কেনো উপায় ছিল না। ছোটবেলার বাম পায়ের গোড়ালিতে বড় একটা তিল ছিল লোকে অনেক সময় মনে করত সেখানে একটা মশা বসে আছে। কেউ কেউ সেটা মারতে হাতের পাঞ্জা তুলত, আমি বলতাম, 'ওটা তিল।'

'ও তিল, বাম পায়ের গোড়ালিতে। তাহলে তো তুমি অনেক দেশ ঘুরতে পারবে।'

'মানে?'

'মানে হল, বাম পায়ের গোড়ালিতে যাদের তিল থাকে তারা অনেক দেশ ঘুরতে পারে।'

কথাটা মাঝে মাঝে আমার প্রায় মনে পড়ত; তখন ভাবতাম বিদেশে কেন যায় লোকে? গিয়ে শান্তি পায় না, তবু কেন সেখানেই থেকে যায়? কেন ফিরে আসতে চায় না? প্রতি পলে পলে আমি আমার যাবার আগে এই কথা মনে করতাম। এখানে যেখানে যাই আমার বাবার পরিচয় মায়ের পরিচয় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। একবার একজন ঠিক করেছিল তার ভাতিঝির সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে। সেসময়ে আমি মোটামুটে ভালই বিপদে পড়েছিলাম। কোনোমতে এড়িয়ে বেঁচেছিলাম তার হাত থেকে। আসলে আমি কে? আমি কী? তা নয় 'আমি কোথা থেকে' তা-ই সবার বিবেচনা। আমি যে একটা আলাদা মানুষ,

আমার যে একেবারেই আলাদা একটা পরিচয় আছে– ভেতরে আলাদা একটা জগৎ আছে, এটা জানতে চাওয়ার কোনো ইচ্ছা কারো নেই।

আমি নিজেকে আলাদা করতে পারছিলাম না, আবার মিশিয়েও দিতে পারছিলাম না। আসলে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার মতো অবস্থা এখানে ছিল না। আমি একা একা সব করতে চাইছিলাম; কিন্তু এক বাসায় থাকা ছাড়া আর কিছুই একা একা করা যায় না। একা মানে কারো সঙ্গে সম্পর্কে নেই তা না, মাঝে মাঝে কারো সঙ্গে দেখা হবে কথা হবে– কিন্তু কেউ কারো স্বপ্ন কি বাস্তবতায় বাগড়া দিবে না। অধিকার ফলানোর ব্যাপারটা আমি একেবারেই মানতে পারছিলাম না।

২৪.

আরিয়ানা আমার সঙ্গে এমন করতে যেন আমি তার একটা খেলানা হয়ে গেছি। বুয়েটে পড়ার প্রথম দিকে তিনটা টিউস্যুনিটা পেয়েছিলাম। এর ভেতরে দুটোই মেয়েছিলা বলে রাজি হইনি। নাইনে পড়া আইমানকেই বেছে নিয়েছিলাম। কলাবাগানে নিজেদের বাড়ি। ফি ভালো দেবে। আইমান পরে বুয়েটে ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ে । ওরই একেবারে ছোটবোন ছিল আরিয়ান। তখন ফাইভে পড়ত। তার বেশ কয়েক বছর পর ওকে যখন আবার দেখি তখন মনে হয়েছিল সেবারই প্রথম আরিয়ানাকে দেখছি। আর সে দেখার সময়ে একটা ব্যাপার আমার কাছে একটা খটকার মতো হয়ে আছে। ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকানোর আগে তার শরীরটা চোখে পড়েছিল। চোখে পড়েছিল মানে কাপড়ের ওপর দিয়ে শরীরের যে আভাস তার দিক থেকে চোখ সরাতে পারিনি। আমার সাধারণত এমন ঘটে না। আরিয়ানা একদিন আইমানকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে বুয়েটে এসছিল। ঠিক তখন আমি একেবারে ওদের মুখোমুখি পড়ে যাই। আমাকে দেখেই ও গাড়ি থেকে বের হয়ে আসে। সেদিনের বাকি সময়টা ওর সঙ্গে গাড়িতে ঘুরে ঘুরে না কাটালে হয়তো আরিয়ানার সঙ্গে কিছুই শুরু হত না। এতদিন পর ওকে দেখে উদ্ভিন্নযৌবনা কথাটার মানে খুঁজে পেয়েছিলাম। যাকে ছোট্টমেয়ে হিসেবে দেখেছি তার নারী হয়ে ওঠার ব্যাপারটা আমাকে এতটাই বিহ্বল করেছিল দেখে পরে আমি নিজেই অবাক হয়েছিলাম। ছোটবেলার কিছু সময় ছাড়া আমি যেকোনো বয়সের মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলি। তাকিয়ে থাকতে পারি একবারও দৃষ্টি অন্যকোনো দিকে না নিয়ে। আশ্চর্য এটা আমি আরিয়ানার সঙ্গে ওইবারের দেখার সময়ে পারিনি। তখন বুঝলাম ভেতরে ভেতরে আমিও সেই কুত্তামানুষ। মাংসের স্বাদের কথা বললে, চরম তৃপ্তির কথা বললে আমার কাছে দুটো ব্যাপারই অনেক পুরোনো। বীণা আন্টি তার একদিন গোসল করে এসে চুল শুকানো যন্ত্রটা স্টিলের আলমারির ড্রায়ার থেকে বের করতে বললে আমি তার ভাইব্রেটর আর ডিলডো বের করে নিয়ে এসেছিলাম। এ দুটো জিনিস দিয়ে কী করে জানতে গিয়েই আমার শরীরাকাশ থেকে নক্ষত্রপতন শুরু হয়। গ্রহতারাদের ঝলকে ঝলকে পথ করার জন্য পেতে দেওয়া হয় সমুদ্র সমান নদী। অ্যানাটমিতে কঙ্কাল দেখানোর মতে করে আয়নার সমানে দাঁড় করিয়ে একটা সরু লাঠি যেটা নাকি পড়ানোর সময় শিক্ষাকরা ব্যবহার করে তা দিয়ে একে একে পরিচয় এবং তার কার্যকারিতা দেখিয়েছিলেন তিনি। আমি সেই প্রথম আয়নার সামনে পুরো খালি গায়ে নিজেকে দেখছিলাম। আরো দেখছিলাম কীভাবে উত্তেজনো ছড়িয়ে পড়ে। আমার কাছে বিস্ময়কর ছিল সেই আয়নার দৃশ্যটি। তিনি সে নির্দেশক কাঠি দিয়ে আমার উচ্ছিত দণ্ডটি নিয়ে মজা করছিলেন। আর মজা করতে করতে সেটা চূড়ান্ত দশায় দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তো আমার কাছে আর কোনো রহস্যই তিনি বাকি রাখেন নি। তারপরও যখন আমি আরিয়ানার দিকে ওভাবে চোখ রাখলাম তা আমাকেই অবাক করেছিল। হয়তো এই কারণেই মনে মনে আমি ঠিক করেছিলাম কোনোভাবেই ওর দিকে কোনো রকম আগ্রহ আমি দেখাব না। আর যখন আমরা নিউমার্কেটের একটা খাবারের দোকানে গিয়েছিলাম ও জানতে চায়, 'আপনি জানেন মেয়েদের পেছনের দিকেও একটা চোখ আছে?'

আমি এমন বিব্রত আর কখনো বোধ করিনি। কিন্তু কী অবলীলায় বলেও দিয়েছিলাম, 'তুমি তো রাতারাতি সুন্দরী হয়ে গেছ।'
'চোখে মুখে না শরীরে?'
কথা বলার ভেতরে চোখ নাচিয়ে কেমন একটা ভঙ্গি করছিল।
'দুটোতেই।' বলেই আমি যোগ করি,'নিয়মিত ব্যায়াম কর তাই না?'
'না।'
'তাহলে?'
'মেয়েদের ফিগার তো একটা বয়স পর্যন্ত এমনই থাকে। আর আমার তো এমন কোনো বয়স হয়নি।'
আরিয়ানার কথাটা ভালো লেগেছিল। পরে আরিয়ানা যখন ওদের ফাঁকা বাড়িতে আমাকে আঁকড়ে ধরে বলেছিল, 'আপনি আমাকে চান না?'
'না।'
'আমার দিকে প্রথম যেভাবে তাকিয়ে ছিলেন মনে আছে?'
'আছে।'
'আমার প্রতি আপনার কোনো লোভ নেই?'
'না।'
'আমি কী আগের চেয়ে দেখতে খারাপ হয়ে গেছি?'
'আরো সুন্দর হয়েছ তুমি।'
'ফিগার নষ্ট হয়ে গেছে?'
'না।'
'তাহলে?'
'আমি বলতে পারব না।'
আরিয়ানা হতাশ হয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। আমি চেয়েছিলাম কথা দিয়ে ওপর ভেতরের জেগে ওঠাটাকে ঝিমিয়ে দিতে। আমাকে ছেড়ে ও কিছু দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। পিঠটাকে অনেকখানি খুলে রেখে কামিজের কাপড়ে অবতলমুখি খাদের নিচে তার নধর পেছনটাতে তাকে এমন আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল, কিন্তু আমি কেবল দেখার আকর্ষণটুকু দেখছিলাম; ভেতরে কোনো কিছু বোধ করছিলাম না। টোরার সময়ও দেখেছি। একবারে খালি গায়ে আমার সামনে নড়ছেচড়ছে আমি কোনো কিছু বোধ করছি না। কিন্তু সারা শরীর ঢাকা কেবল মুখটা খোলা তাতে এমন একটা ভঙ্গিতে আমি ভেতরে বিশাল বিশাল তোড়ে ফুঁসে ফুঁসে উঠছি। তখন বুঝি, আসলে ওরা কোন অবস্থায় থাকুক না-থাকুক তাতে আমি কোনো কিছু বোধ করি না। এই বোধ করাটা আমার ভেতরের ব্যাপার। এভাবে আমি দেখছিলাম আমার এই আবেগটুকু কোন অন্ধকার থেকে উঠে আসে। আমি সেই অন্ধকারটাকে চিনতে চেয়েছি। কিন্তু বারবার চিনতে ব্যর্থ হয়েছি। কখনো কখনো ঘরে কেউ নেই, আমি তখনও ফুঁশে উঠি। আসলে এর জন্য আরিয়ানার ওই সুন্দর দেহাবয়ব বা টোরার ও বিধ্বংসী ভাবভঙ্গিগুলির কোনোটাই আমাকে নড়াতে পারে না, যদি না আমি নিজে না নড়ি।

২৫.

আমি লন্ডনে আসার পর বুঝি আমাকে ফের নতুন করে লেখাপড়া করা শুরু করতে হবে যদি আমি এখানে ভালো কিছু করতে চাই। আর নইলে ব্যবসা বাণিজ্য করার নতুন কোনো ফন্দিফিকির খুঁজে নিতে হবে। কোনোটা করব বুঝতে পারি না। আমি দেখলাম লেখাপড়া করাটা আমার জন্য সমস্যা নয় কিন্তু এর জন্য

টাকা আমার চাই– সেটা আমি কোথা থেকে পাব। এদিকে মার্চেন্ট বন্ধুর কাছ থেকে অনেক টাকা ধার করেছি। ওকে কেবল টাকাটা দিতে বলেছিলাম। বলা মাত্র দিয়ে দিয়েছে। সে টাকাটা কম নয়। কিন্তু তাও না হয় শোধ করে দিলাম অল্পদিনে। দেখলাম যে স্বাভাবের জন্য আমি জীবনের মজাটা পাইনি তা-ই এখানে সেভাবেই আছে। আমি তাহলে কোথায় যাব? সবখানে আমি আমার তৈরি পাতা ফাঁদেই বন্দি হয়ে থাকব? কোনো ফাঁদে পা দেব না– এও যে মনের এক ফাঁদ তা কে জানত।

লোকে যে বলে, জীবন সবখানেই একরকম তা-ই বুঝলাম আরেকবার। বাংলাদেশের অজ পাঁড়া গা থেকে ঢাকায় আসা কোনো ছেলে যার কোনো থাকার জায়গা নেই, কোনো চাকরি না হলে যে অসহায় অবস্থায় ধার-দেনা করে চলে– ঢাকা থেকে লন্ডনে এসে আমার মতো অনেকের দশা কিন্তু হুবহু তা-ই। তবে সেখানে রক্ষা হল ভাষাটা একই রকম, এখানে ঝামেলা হল ভাষাটা। আমি মোটামুটি ইংরেজি জানি, ইংরেজিতেই তো সবপড়ালেখা করতে হয়েছে তারপরও ওদের ইংরেজি বুঝতে আমারও সময় লেগেছে। যদিও খুব একটা সময় আমি নেইনি। নেবও যে না তা আমি আগেই জানতাম।

নিজের দেশে যেটা কখনো ভাবিনি তা-ই এখানে এসে ভাবতে শুরু কলাম– যে কোনো মূল্যে আমাকে এখানে এমন একটা জায়গা করে নিতে হবে– যে জায়গাটায় আমি একক– সেখানে আমাকে ছাড়া বিকল্প কারোকে কেউ ভেবে নিতে পারবে না, যতদিন আমি এখানে থাকব। আর আমি তাই করেছিলাম।

প্রতিদিন নির্ভুলভাবে কাজ করতে করতে আমি সবার নজরে পড়ে গেলাম। দেশে আমি যেমন আড়াল খুঁজতাম, নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলাম, এখানে এসে আমি হয়ে ততটাই নিজেকে মেলে ধরলাম। আমি কোনো কাব্য করতে এখানে আসি নি। আমি এখানে এসেছি নিজের যোগ্যতার পরিণতি দেখে নিতে। আর আমি জানি জায়গা যেটাই হোক লড়াই করতে জানলে সব জায়গায় জেতা যায়। আমি হঠাৎ রাগের মাথায় চাকরিটা ছেড়ে দিয়েও বুঝেছি আমার কোনো আফসোস হচ্ছে না।

আর তার প্রমাণ মিলল কদিন পরই আমাকে যখন একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী তার ফার্মে জয়েন করতে বলল। ভালো কাজ করতে পারে এমন কয়জনকে বলে তিনিই কায়দা করে তার ফার্মে এনে জড়ো করেছেন। জীবনের কত রকমই না কায়দা কানুন আছে। কিছু স্থান শূন্য হবেই। একজন আরেক জনের জায়গা পূর্ণ করে। দেশে শিল্পপতির জায়গা খালি হলে তার জায়গায় আসে নতুন কেউ। ভিক্ষুকের জায়গা খালি হলে তার জায়গায় আসে নতুন ভিক্ষুক। এখন এগুলিকে একেবারে স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার বলে মনে হয়।

এর কদিন পর ঘর থেকে বেরিয়েছি, রাস্তায় নেমেছি কি নামিনি আরিয়ানার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওর আলো আলো বলে টেনে টেনে ডাকা শব্দক'টা আমাকে সেদিন রাতেও তাড়িয়ে বেড়িয়েছিল। আমি দেখছিলাম সেই পুরোনো স্বপ্ন: একটা অন্তহীন সুড়ঙ্গের ভেতরে দিয়ে মশাল হাতে চলেছি। আমার গায়ে কোনো কাপড় নেই। শরীরে শীত-গরমের কোনো অনুভূতি নেই। অথচ দরদর করে ঘামছি। সেই ঘাম মাঝেমাঝে পায়ে পড়তেই চমকে উঠছি, এমন ঠাণ্ডা হয় ঘাম। আমি একবার ঢাকা শহরে এক গলির ভেতরে ঠেলাগাড়ি করে ইটসিমেন্ট নিয়ে যাওয়া শ্রমিকের গায়ের ভেজা ঘাম আমার হাতে লেগেছিল। চাপাগলিতে পার হতে গিয়ে গায়ে গায়ে ঘেষে যেতে হয়েছিল। সেবার প্রথম টের পেয়েছিলাম গায়ের ঘাম বুঝি এমন ঠাণ্ডা হয়? মনে মনে সাজিয়েছিলাম যে প্রচণ্ড পরিশ্রমের জন্যই ঘাম বের হয়, কিন্তু তার প্রকৃতি হয় ঠাণ্ডা, এ থেকেই বোঝা যায় প্রচণ্ড পরিশ্রম করে যেটা হয়, তার জন্য শান্তি ও প্রাণ-জুড়ানো-দিন অপেক্ষা করে।

২৬.

প্রাণজুড়ায় কিসে? এক দম্পতির একটার পর একটা সন্তান হত আর হয়েই কিছুদনি পর মরে যেত। এভাবে প্রায় চারটা সন্তান মারা যাওয়ার পর যে সন্তানটি বেঁচে গেল বাবামা তার নাম রাখলেন প্রাণজুড়ানো রায়। তাদের পরে আরো কয়েকটি সন্তান সন্ততি হয়। সবাই চলে যায় ভারতে। কেবল রয়ে যায় প্রাণজুড়ানো রায়। পাকিস্তান হওয়ার আরো অনেক পরে ষাটসালের গোড়ার দিকে হিন্দুদের ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে দেখে তরুণ প্রাণজুড়ানো খৃস্টান হয়। নাম হয় ইমানুয়েল ডি কস্টা। তিনি আমাদের পাশের বাড়িতে ভাড়া থেকেছিলেন। আম্মার সঙ্গে ওনার স্ত্রীর মায়ের খুব খাতির হয়েছিল। কাকিমা বলে আমরা ডকতাম। ইমানুয়েল কাকা দেখতে ছিল কালো কুচকুচে। দোহারা গড়নের বলিষ্ট শরীর। মাথায় একটু টেকো টেকো ভাব ছিল। বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ থ্যাবড়ানো নাক, পাতলা চাপা ঠোঁট। মুখের ভেতরে এমন একটা মায়া ছিল যে কাকাকে দেখলেই ভালো লাগত। আমাদের আদরও করতেন খুব। ওরা ছিল এক ভাই, দুই বোন। ভাইটা আমার সঙ্গে পড়ত অ্যালবার্ট ডি কস্টা, ডাক নাম ছিল রিন্তু। বোন দুটোর ছোটটার নাম ছিল অ্যানজেলা ডি কস্টা বড় জনের নাম ছিল অ্যাগনেস ডি কস্টা। রানু আর রাখি। রানু, মানে যার নাম অ্যানজেল ডি কস্টা দেখতে সত্যিই পরীর মতো ছিল। একদিন সাদা ফ্রকে ওকে সন্ধ্যাবেলা রোড লাইটের আলোয় দেখে মনে হয়েছিল ঠিক এইমাত্র একটা পরী আকাশ থেকে নামল। ওদের মা ছিল ওদের বাবার তুলনায় ততটাই ফর্সা, তাও আবার গোলাপি ফর্সা। একটু মোঙ্গলিয়ান ধাঁচ ছিল। ছোট ছোট চোখ কিন্তু ওদের সবাই আর কিছু না হলেও বাবা মতো ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ পেয়েছিল। রিন্তু সঙ্গে আমার কিছুদিনের ভেতরে দারুণ বন্ধুত্ব হয়েছিল। রাশুর পর রিন্তুই আমার সত্যিকারের বন্ধু হয়ে উঠেছিল। কিছু হলেই আমি ওকে যিশুর কিরে কাটাতাম। আমাকেও যিশুর কিরে কাটাত, 'বল যিশু বল।' আমিও বলতাম, 'যিশুর কিরে।'

একবার টাউন হলে জমজমাট ফাংশন হল। সেখানে 'জিমি জিমি আ যা আ যা' গানের সঙ্গে ছোট্ট অ্যানজেল ডি কস্টার দুর্দান্ত সুন্দর ডিস্কো নাচ পুরো জেলাশহরের লোকজনকে মাত করে দিয়েছিল। পরের দিন ওদের বাসায় গেছি।

'কাকী রিন্তু কোথায়?'

'ও না এইমাত্র বের হল।'

'আচ্ছা আমি তাইলে যাই।'

'বস। তোর সঙ্গে কথা আছে।'

কাকির গলায় কীযে মিষ্ট ছিল!

আমি বলি, 'না না এখন আসি।'

'ওমা আমি তোকে একটা কথা বলব আর তুই ছুট দিচ্ছিস!'

আমি দাঁড়ালাম, 'আচ্ছা; বলেন।'

'কালকে রানুর নাচ কেমন দেখলিরে।'

'দারুণ।'

'তোর পছন্দ হয়েছে?'

'খুবই। কি তালি যে দিল লোকে।'

'তুই দিস নি?'

'আমি বুঝি লোকের ভেতর পড়ি না?'

'ওবাবা তুই তো লোকের মতো কথা কথা বলছিস দেখি।'

পরের দিন আম্মাকে বলেছিলেন, 'ভাবী, আপনার ছেলে তো দারুণ কাটা কাটা কথা বলতে শিখেছে।'

আর তখন আমাকে বলছিলেন, 'রানুকে তোর কেমন লাগেরে?'

'ভালো।'

‘রানুকে বিয়ে করবি?’
‘না।’
‘কেন? আমার মেয়ে দেখতে সুন্দর না?’
‘হ্যা।’
‘তো?’
‘ছোট যে।’
‘তুই ও তো ছোট।’
‘হ্যা। এই জন্যই তো বলছি বিয়ে করব না।’
‘পরে করবি?’
‘কবে?’
‘বড় হলে?’
‘আগে বড় হয়ে নেই তারপর দেখা যাবে।’
মুখে মুখে কথাগুলি বেশ বলে গেলেও আমি একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি অনেক সময় খেয়াল করেছি, বলতে বলতে ভেতর ভয় পেয়েছি কিন্তু মুখে কিছুই স্বাভাবিকভাকে কথা বলে যাচ্ছি। আমি কোনোকালে বিদ্রোহী ধরনের কেউ ছিলাম না। অন্তত কিছু ছেলে থাকে স্কুলে গেলে স্যার ম্যাডামদের যারপর নাই জ্বালিয়ে মারে, ঘরে বাবামাকে জ্বালায় বাইরে পাড়া প্রতিবেশিকে। আমি তেমন কোনো ছেলে ছিলাম না বা হতে পারিনি। হতে পারিনি কারণ অনেককে দেখতাম জিদ করে রাতারাতি বদলে যেতে। যে ছেলেটার সিগেরেট খাওয়ার কথা না একদিন কারো কাছে মার খেয়ে সে সিগারেট টানতে শুরু করে দিল।
‘সিগারেট টানছিস যে?’
‘বুকে আগুনটাকে মুখে নিয়ে টানছি।’
এসবকথা একেবারে ছোটবেলায়ই শোনা। বড় হয়ে যখন ভার্সিটিতে পড়ি সিগারেটের টানার অভ্যাস আছে একজন বলেছিল,‘বুকটারেও ছাই বানালাম, টাকাটারে ছাই বানালাম।’ এসব ব্যাপারেও আমার মনে হত আমি আসলে এক লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু করতে পারি না, কিন্তু সারাক্ষণ তো লেখাপড়া করা যায় না, মাসে অন্তত একটা দুটো দিন অন্য কিছু করা যায়। ভীষণ ব্যস্ত লোকরা বলে না, ‘অবসর! সেটা আবার কী?’ তাদের কাছে কাজই বিশ্রাম। কাজটা করে তারপর মাঝে মাঝে থেমে কাজটাকে আপাদমস্তক দেখে তা উপভোগ করে। এর ভুলগুলিকেও পর্যন্ত ভুলগুলি খুঁজে বের করা আর তা কতটা ঠিক করা যায় তাই হয়ে ওঠে তাদের কাছে বেঁচে থাকার রোমাঞ্চ।
বীণা আন্টি বলেছিলেন, ‘কিছু বুঝে ওঠার আগেই তোমাকে আমি নষ্ট করেদিলাম।’
আমি বলি, ‘এটা তো বাইরের ব্যাপার আমি তো ভেতরে নষ্ট নই।’
‘মানে?’
‘মানে হল, তাহলে তো আমি দেখা যেত একটা মৌতাতে মেতে আছি। আপনার কাছে আসার জন্য প্রাণ আমার আইঢাই কররেছ কিন্তু আমি তো তা করি না।’
‘বরং আপনি ডাকলে আমি আসি ’
‘তার মানে, তোমার কোনো আগ্রহ নেই?’
‘তাতো বলি নি। আপনার ডাকের জন্য আমি অপক্ষোও করি কিন্তু সারাক্ষণ তাই নিয়ে তেতে মেতে থাকব – তেমনটা আমার মনে হয় না।’
বীণা আন্টি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘তোমার আর কাউকে ভালো লাগে? চোখে দেখতে তো অনেককেই ভালো লাগে, কিন্তু তার সঙ্গে থাকার জন্য বা তার সঙ্গ পাওয়ার জন্য আমার কোনো

আগ্রহ আমি বোধ করি না। আমি আসলে জানি না আমি... আমি...।' আমি কী যেন একটা বলতে চাইছিলাম তাও আমার মুখে আসছিল না। আমি জানি এই যে আসার জিনিসটা চাইতে না পারা আর আমতা আমতা করার ভেতরেই আমার সমস্ত সমস্যাগুলি যেন জমে আছে। কেন আমি বলতে পারি না। আর বলতেই কেন হবে আমি যা চাই তার জন্য গোপানে গোপনে কাজ শুরু করে দিলেই হয়। আর কেউ যদি জানতে চায়, আমি কী চাই? তখনও কী বলা উচিত? যা চাওয়া তার জন্য গোপনে গোপনে কাজ করা – এছাড়া আমাদের মতো লোকদের আর কী করার আছে।

আমরা সবাই এক একজন এই পাথুরে শহরে গেরিলা যুদ্ধে নেমেছি। যে জিনিসটাকে আক্রমণ করতে হবে বা কব্জা করতে হবে তার নাম সাকসেস– আধুনিক মানুষের অনিবার্য অসুখ। আমাদের ব্যাচের মজনিউল বলত, 'সাক ইয়োর সাকসেস।' আমি অবশ্য এতটা রাগ করতে পারি না। মজনিউলের একটাই লক্ষ্য ও কম-সে-কম কোটিপতি হবে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের আগে। এবং এর ডেড লাইন চূড়ান্ত হল চল্লিশের মধ্যে। বলত, 'চল্লিশের ভেতরেই বোঝা যাবে কে বস হবে আর কে হবে না, কে অন্যের হয়ে খাটবে।' আমার এই নিয়ে কোনো ব্যস্ততা ছিল না। যারা অতি সহজেই বা অল্প বয়সেই জীবনের একটা গতি করে ফেলতে পারে তারাই দ্রুত একটা গণ্ডিতে আটকে যায়। না চাইলেও আটকাতে হয়। সব সময়ই কাজের জায়গা ফাঁকা হয়; কারণ সেখানে যারা কাজ করতে তারা এক সময় বুড়ো হবে, তাদের কাজ করার সামার্থ্য কমে আসতে থাকবে, তাদের জয়গায় নতুন লোক নিতে হবে। এটাই তো নিয়ম। জগতে এইভাবেই ভারসাম্য আসে। কিছু লোক সরে যাবে, তাদের জায়গায় নতুন লোক আসবে– এই তো হয়েছে চিরকাল, হবেও চিরকাল। তাই ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। অন্তত কাজের চূড়ান্ত দেখার জন্য। কাজ কেবল যেটা যে পারে তা সময় মতো করা। সময় গেলে সাধন হবে না– এটা হল কেবল সাধনার মূল কথা না সব কাজেরও মূল কথা।

'বিষয়টা অনেকটা নামাজ পড়ার মতো।'

'সেটা কী রকম?'

'নামাজ পরা ফরজ– মানে শুধু পড়াটাই ফরজ নয়– ওটা ওই সময়ের মধ্যে ফরজ। ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেটা পড়তেই হবে। তারপরে তার আর কোনো মূল্য থাকে না। তিনদিনের নামাজ একদিনে পড়বা– এটার কোনো মূল্য কী আছে? সেটা বুঝতে হবে। যে কাজটা যে সময়ে করার কথা তারপর তা করলে ওটার আর কোনো মানে থাকে না– ধর্মকর্মের সবখানে এই ইংগিতটাই দেওয়া আছে।'

'বাহ, তুমি দেখি ধর্মের কথাও ভালো জানো এতো একেবারে নতুন ইন্টারপ্রিটেশন। মোল্লারা তো এটা মনে হয় না এটাকে মানবে। মোল্লারা হল একাডেমিশিয়ান, সেখানে ধর্মের একটা ছক আছে, কিন্তু তা দিয়ে কোনো কালেই আমজনতার ধর্ম চলে নি। অন্তত যেগুলি আমাদের জীবনের সঙ্গে নিত্য জড়িয়ে থাকে তার আলাদা ক্ষেত্র আছে।'

'একাডেমি একটা দিক তুলে ধরে কিন্তু সেটাই চূড়ান্ত নয়। আমাদের জীবনের সঙ্গে কী কী জড়িয়ে থাকে? প্রথমটা হল শিক্ষা। মজার ব্যাপার হল কেউ কেবল প্রতিষ্ঠানে পড়ে কোনো কালে শিক্ষিত হতে পারে না। বরং শিক্ষত হওয়ার জন্য যে বর্ণ পরিচয়গুলি বা যে অক্ষরগুলি চেনা দরকার টুকু কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে শিখে থাকে। এর পর যদি যে লেখাপড়া ছেড়ে দেয় তাহলে সে সারা জীবনের জন্য এক ধরনের মূর্খামিতেই কাটায়। তা সে যতই ডক্টরেট করুক আর না করুক। আসলে নিজের থেকে বাইরে না দাঁড়ালে যেমন নিজেকে দেখা যায় না শিক্ষার থেকে বাইরে না দাঁড়ালে তা দেখা যায় না।'

আমি বীণা আন্টির ওখানে গেলেই ইদানীং আলাপগুলি কেমন যেন তত্ত্বীয় দিকে চলে যায়। মানুষ বয়স বাড়লে কি তার ভেতরে কাজের ক্ষমতা কমে যায় বলেই সে কথা বেশি বলে? কোনো অঙ্গ হারিয়ে গেলে মানুষের যেমন বলে অন্যদিকে ক্ষমতা বাড়তে থাকে– এও তেমন ব্যাপার বোধ হয়। মাঝে মাঝে গেলে

এর একটাই কাজ এবং প্রধান কাজ হল বিছানায় যাওয়া আর প্রচুর চর্বচুষ্যলেহ্যপেয়তে প্রাণ ভরিয়ে চলে আসা। বীণা আন্টি দারুণ রান্না করতে পারেন। আমি বলতাম,'যারা রমণদক্ষ তারা রন্ধনদক্ষও নাকি?'
বীণা আন্টি বলতেন,'তা তো বলতে পারব না, তবে রমণে যারা দক্ষ অন্তত সেটা মগজ দিয়ে অনুভব করতে পারে তাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিভা গজিয়েই ওঠে। পেনিস ইজ দ্য এক্সটেশন অব ব্রেইন হলে, মেয়েদের দিকে সেটা মনে হয় অন্যান্য শিল্প উপভোগের ক্ষমতাটাকে বাড়িয়ে দেয়। এজন্য আর্টকালচারে আসতে চাওয়া মেয়েরা রমণদক্ষ হয়, আবার রমণদক্ষ মেয়েরা অনেকেই আর্টটাকে ভালো বুঝতে পারে।'
বীণা আন্টির সঙ্গে এসেব আলাপ করে রাতও শেষ হয়ে যেত মাঝে মাঝে। আমি একদিন বলি, 'আপনার কাছে কত দিন আসি কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমি তো আসলে কিছুই জানি না।'
'কী জানতে চাও?'
আমি বলি, 'কেউ না জানাতে চাইলে, আমি নিজ থেকে কিছু জানতে চাই না।'
তিনি বলেন, 'আর আমি কেউ না জানতে চাইলে কিছুই বলি না। শুধু আমি-ই না এটা মেয়েদের প্রধান স্বভাব। তুমি খেয়াল করবে, মেয়েরা নিজ থেকে প্রায় কিছুই বলতে চায় না। অন্তত বাঙালি মেয়েরা, কিন্তু যারা সৎ যাদের সাহস আছে, আর যারা তোমার ওপর আস্থার রাখতে পারবে তারা কিন্তু জানতে চাইলে অনেক কিছু তোমাকে বলবে। কিন্তু না জানতে চাইলে কিছুই বলবে না। যেমন আমি আমার এক পুরুষ কলিগের কথা বলতে পারি। আমার আরেক সহকর্মীর কঠিন প্রেমে সে পড়ল। কিন্তু কথা প্রথমে বলল আমাকে যে আমাদেরই ক্লিনিকেরই একটা মেয়ের প্রেমে সে পড়েছে। আমি বললাম, তাকে সে আগে থাকতে চিনত কিনা? সে বলল, চিনত। কিন্তু এখানে আমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে তার আগে থাকতে চেনা পরিচয়ের কথা না। আমি প্রথমে ধরে নিয়ে ছিলাম সেটা আমি-ই। কিন্তু পরে জানতে পারলাম আমার সেই মহিলা কর্মীর কাছে তাকেই সে বলেছে সরারসরি যে তার ভেতরে এমন কিছু ইংগিত ছিল যা থেকে সে ধরে নিয়েছে লোকটাকে সে চায়–কিন্তু এখন বলছে সে তেমন কিছু ইচ্ছাকৃতভাবে বলেনি। কিন্তু ওই লোকের অবস্থা খুব করুণ। দিনরাত ওই মহিলা ছাড়া সে আর কিছু চিন্তা করতে পারে না। সারাক্ষণ ভাবে কখন তাকে দেখবে, দেখতে না পারলে সারাক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে। এইসব চলছে আর কি। আচ্ছা, তোমার মাথার ভেতরে এমনভাবে কোনো মেয়ে ঢুকে ছিল কখনো?'
আমি কী বলব? বলব কি যে সেই ব্যক্তিটি তিনিই? নিজের কথা যে সবসময় খুব ভাবি তা মনে হয় না। অনেকে আছে একা একা থাকলে নিজের সঙ্গে কথা বলতে চায় । সারাক্ষণ একটা মানুষ আরেকটা কিছু সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায়, যোগাযোগ করতে চায়। অন্যে না হলে নিজের সঙ্গেই নিজে যোগ দিচ্ছে। এটা সে করছেই।
আমি একা থাকলে আমি কী কী ভাবি? আমি এমন কিছু ভাবি যা আর কারো ক্ষেত্রে ভাবি না। আমি কেবল আমার ক্ষেত্রে ভাবি। খুব ছোটবেলায়ই আমি বুঝি, আমার কী যেন নেই ? সেটা হল বাবা। পরে জানি আমার বাবা আছে। এবং তিনি বেঁচে আছেন। এবং তিনি আমার মাকে বিয়ে না করেই আমার জন্ম দিয়েছেন। আমি সবখানে যে বাবার নামে পরিচিত তিনি আমার বাবা নন। বরং তিনি আমার মায়ের স্বামী কিন্তু তিনি আমার মাকে সন্তান দেওয়ার আগেই যুদ্ধে মারা যান। এদিকে আমি পরিচিত মুক্তিযোদ্ধার সন্ত ান হিসেবে কিন্তু আমি তা-ই কী? কেবল তা-ই নই আমি যাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ তাদের একজনের সন্ত ান। কিন্তু তাতে কী হয়েছে। আমার মা আমাকে ঠিক মতো বড় করেছেন। আমি যাকে মামা বলে জানি তিনি আমাকে পিতার স্নেহে বড় করে তুলেছেন। তাকে আমি মানুষ হিসেবে অনেক বড় মনে করতাম কিন্তু পরে জানি– তিনি সারা জীবন নিজের স্ত্রীকে কষ্ট দিয়েছেন। এজন্য দিয়েছেন তাকে বিয়ে করতে নিষেধ করা পরও সেই নারীটি তাকে বিয়ে করতে তার পরিবারকে মত দেয়। তিনিও বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছিলেন। এদিকে নিজের বাবার আদেশ অমান্য করা সাহস নেই। অন্য দিকে বিয়ে করার প্রতি তার

কোনো আগ্রহ নেই। মহিলা ভেবেছিলেন বিয়ের পরে তার ভালোবাসা দিয়ে তিনি তার সমস্ত অনাগ্র দূরে করে দিবেন।

লোকে বলে যে কেউ ভালোবাসা পায় না। বলে, কেন ভালোবাসা হারিয়ে যায়?– সবাই কম-বেশি ভালোবাসা পায়, কিন্তু যাকে সে ভালোবাসে– তাকে না পেলে, বা তার কাছ থেকে ভালোবাসা না পেলে– তার মনে হয় কোনোদিন ভালোবাসা তার পাওয়া হল না। হাজার ভালোবাসা পেলেও সেই না-পাওয়ার কষ্ট তার কোনো দিন দূর হয় না।

আমি অবশ্য তেমন কিছু জানিনি যে তিনি কাউকে চাইতেন কিনা। ভালোবেসে চাওয়ার আলাদা একটা নেশা থাকে। একাবার সেই নেশায় পড়ে গেলে সহজে তা ছাড়ানো যায় না। এর বেদনাও অন্যরকম একটা আরাম দেয়। দাদের মতো চুলকিয়ে আরাম পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যুদ্ধটাও বলে এরকম ব্যাপার– পৃথিবীর গায়ের দাদের মতো লেগে থাকে এখানে ওখানে। যুদ্ধ হল পৃথিবীর অসুখ। দাদ শুকায় আবার দেখা দেয় আর তা চুলকিয়ে আরাম বোধ হয়। প্রেমের সঙ্গে যুদ্ধের এখানটায় একটা মিল আছে। তখনও বীণা আন্টির প্রেমে আমি পড়েছি কিনা জানি না, তবে তার সমস্ত কিছু আমাকে টানত নেশার মতো টানত। আমি বুঝতে পারতাম না আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ আমি তখন আমার ওপর বোধ করতে চাইতাম না। মাঝে মাঝে মনেও হয়েছে তার প্রতি আমার তীব্র শারীরিক আকর্ষণ ছাড়া কিছু নেই। প্রবল একটা শরীরী টান কোনো মেয়ের সঙ্গে স্পর্শ মাত্র আমি বোধ করতাম, বিশেষ করে যাদের দেখে মনে হত এর সঙ্গে বিছানায় গেলে কেমন অনুভূতি হতে পারে। আবার একটা সময় নিজেকে এর জন্য এত বাজে একটা লোক বলে মনে হত। আমি কি পার্ভার্টেড? কিন্তু আমি তো মনে মনে পার্ভার্টেড হলেও বাস্তবে তেমন কিছু করিনি। নাকি যেজিনিসগুলি মনে আসে বাস্তবে তা কাজে করলে এসব কোনোভাবনায়ই আমার ভেতরে দেখা দিত না। যারা নীল ছবির নায়ক তাদের কি কখনো মেয়েদের নিয়ে কোনো আচ্ছন্নতা থাকে? মনের ভেতরে সারাক্ষণ বয়ে বেড়ানোর মতো কোনো আচ্ছন্নতা? কে জানে হয়তো থাকে, হয়তো থাকে না–আমি তা কীভাবে বলব। আমার তেমন কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলার খুব ইচ্ছা– আসলে তারা কী বোধ করে। কিন্তু জীবনের এটাই কী সবচেয়ে একান্ত জানার মতো কোনো বিষয়? আরো কত কিছুই তো আছে। জীবনে প্রতিহিংসা আছে, বিপন্নতা আছে, হাজারো বিস্ময় আছে, বন্ধুত্ব আছে, প্রতারণা আছে– আরো কত রহস্যের নিত্য লীলা চলে– সেসব ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ কি নেই?

তাও তো আমার ভেতরে আছে। কিন্তু আমি ঘুরে ফিরে এদিকে চলে আসি কেন বারবার? মাঝে মাঝে মনে হয় আমি সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের নিয়ে বিরাট একটা ঝামেলা যে পৃথিবী জুড়ে তৈরি হয়েছে তার নাড়িনক্ষত্র জেনে নেওয়া দরকার। ধর্মের ভেতরে রহস্য তো আসলে আর কিছু বাকি নেই। সব ভেঙে চুরে নাশ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাসের বিকল্প কিছু তো তৈরি হচ্ছে না সাধারণ মানুষের জন্য? তারা কী নিয়ে থাকবে? আমি জানি ভালোবাসার পথই আসল পথ, কিন্তু সে পথে নিজেকে ভাবতে গিয়ে কেবলই মনে হয়েছে, কেউ যদি আমাকে ভালোবাসে তাহলে তা যে একেবারে পরিপূর্ণভাবেই ভালোবাসা হয়, আমাকে জড়িয়ে ধরার সময় যেন তার ভেতরে কোনো রকম খাদ না থাকে। কিন্তু আমার ভয়টাই এখানে যে সময়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল তাতেও আমি তার পুরোটুকুটাকে পাব না। আর তখনই মনে হয় চাওয়াটাই থাকুক। ভালোবাসা চাইলে পুরোটুকু নিয়ে কেউ আসুক। তাতে কোনো ভাগ আমি মেনে নেব না। আর তাই আমি চাই না কেউ আমাকে তার অর্ধ ভালোবাসা দিয়ে জড়িয়ে ধরুক বা জড়িয়ে থাকুক। এজন্য কারো স্পর্শ আমি সহ্য করতে পারি না। আর যে স্পর্শ কেবল শরীর জাগানোর তার সঙ্গে মনের কোনো সম্পর্ক নেই। সেই স্পর্শ তো ক্ষণিকের তার থাকা ও চলে যাওয়া বেশি সময়ের ব্যাপার নয়। কোনো কিছুই কি দীর্ঘস্থায়ী নয় যদি না তা লালন করা না হয়? ভালোবাসা কেবলই হারিয়ে যায়। তাকে কখনোই হাতের নাগালে পাওয়া যায় না। আমি কেবল এই শব্দটাকে বোঝার জন্য যাত্রা করেছি পৃথিবীর

পথে। একে একেবারে আমার মতো করে বুঝে নিতে। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারিনি। একেক সময় একে একেক রকম মনে হয়েছে। কখনো মনে হয়েছে একে তো বলে...না না এটা ঠিক নয়, এই ধারণা কখনো কিছুক্ষণের জন্য কখনো কয়েকদিন পরে ভেঙে গেছে। কেবল সেটা ভেঙে যাওয়াই সব নয় সেইসঙ্গে ভেঙে গেছে আমার বিশ্বাস। একটা সত্যকে যতক্ষণ বিশ্বাস করা হবে ততক্ষণই তার আয়ু। তা ভেঙে গেলেই এর আর কোনো মূল্য নেই। একসময় যে বিশ্বসের জন্য জীবন বাজি রাখতে ইচ্ছা করে অনেক পরে গিয়ে মনে হয় কী বোকার মতোই না ভাবা হত ব্যাপারগুলিকে।

'আমরা যারা অবিরাম ভুলের ভেতরে দিয়ে নিয়ে গেছি এই বেঁচে থাকাকে/ তারা তো জানি না কোথা থেকে এরই ভেতরে ভেসে এসেছিল ভালোবাসার অচেনা সৌরভ/ আমরা তা চিনে নিতে পারিনি/ আমাদের দুয়ার তখন বন্ধ/ জানালাও খোলা নেই/ তারপর ফিরে গিয়ে আর ফিরে আসেনি সে।' তার একবার আসাকে উপেক্ষা করার শাস্তি আমাদের হাজার বছর অপেক্ষার আগুনে পোড়াবে পোড়াবে আর পোড়াতেই থাকবে।

বীণা আন্টি এজন্য বলেন, 'ওসব ভালোবাবসাটাসা প্যাচপ্যাচে রোমান্টিকতার কোনো মানে নেই। এর যে ঝাঁপ দেও; কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখো– তাহলেই সব ক্যাতক্যাতে প্যাচপ্যাচে এই সব কেটে যাবে।' আমি জানি না আমি তাকে বোঝাতে পারব কিনা– কাউকেই বোঝাতে পারব কিনা জীবনটাকে একেবারে নিজের মতো বুঝে নিতে হলে সবার আগে বুঝে নিতে হয় ভালোবাসাকেই। কাকে তুমি ভালোবাসো? কী তুমি ভালোবাসো? আর কে বা কারা তোমাকে ভালোবাসে? কিন্তু তার আগে তো বুঝে নিতে হবে ভালোবাসাকেই। ভালোবাসাটাই বা কী? বুঝ নিতে হবে নিজের মতো করে। কে যেন বলেছিল বা কেউ না, আমিই অনুভব করেছি, ভালোবাসা প্রকৃত অনুভূতি জন্মায় হয় প্রথম বয়সে ; নয়তো শেষ বয়সে। মাঝামাঝি সময়টা আসলে কেবল স্বার্থে জড়িয়ে পড়া আর স্বার্থসাধনের সময়। ভালোবাসা তখনই হয় যখন জীবনেকে একেবারেই কেউ জানে না, আবার তখনই হয়– যখন জীবনটাকে খুব ভালো মতো জেনে নেওয়া হয়েছে। তাই একেবারে অল্পবয়সিরা বা একবারে বৃদ্ধরা সত্যিকারের ভালোবাসতে পারে। এছাড়া সবখানে সব সম্পর্ক কেবল স্বার্থ আর অংকে জড়ানো।

কিন্তু তারপরই মনে হয়েছে না তা কেন হবে? আমি যা জানি সেই একই ব্যাপার অন্যে আরেকরকম ভাবে জানে। আগুনের হাত দিলে হাত পোড়ে– এই বাস্তবতার মতো ভালোবাসার বাস্তবতা যদি সবার কাছে একইরকম হত তাহলে হয়তো আর কিছু খেঁজার ইচ্ছা মানুষের হত না। সে এ ব্যাপারটা জানে না বলেই এই অনুসন্ধান চলতে থাকে, চলতেই থাকে। কেমিস্ট্রি দিয়ে, কোনো প্রকৌশল দিয়ে একে কোনোভাবেই বোঝা যায় না। আমি অন্তত সেরকম কিছু মনে করতে পারি নি। আমাদের যে পরিস্থিতির ভেতরে বেড়ে উঠতে হয় সেখানে আর কোনো গতি থাকে না একে অন্যভাবে বিচার করা ছাড়া। আমি জানি এই খোঁজা চলে কারো কারো একেবারে মরণ পর্যন্ত।

আমার জীবনে কত দিন ধরে এটা চলবে জানি না কিন্তু কেবলই মনে হয় কোনো খামোখা আমি এর জন্য জীবনটাকে জটিল করে তুলছি। এত জটিলতা এত খোঁজাখুঁজির তো কিছু নেই। হ্যা, কিন্তু সেই মানুষটার জন্য খোঁজ তো চলতেই থাকবে। সেই মানুষটা যাকে আমি সত্যিকারের ভালোবাসা বাসতে চাই এবং যে আমাকেও সত্যিাকারের ভালোবাসা বাসবে কিন্তু কে জানে এই জীবনে সেই ভালোবাসা হবে কিনা।

কেবল আমি বুঝত পারি, কেউ বোধ হয় আমার ভালোবাসা নেওয়ার মতো বড় নয়, বা সবাই এত বড় যে আমার ভালোবাসা নিয়ে কোথাও রাখলেও তার বিন্দু হয়ে যায়। হয় আমি পাত্র হিসেবে ছোট নয়তো অন্যরা। বা সবাই বড়, আমিই ছোট। তারপরও আমি একেবারে কামগন্ধহীনভাবে ভালোবাসাটা পেতে চাই। বসনাটা সেখানে কেবল দ্বিতীয় ধাপে; প্রথম ধাপে প্রেম শুধু প্রেম। আমি জানি না কোনো কোনো সময় নিজেকে এমন গতিতে খুঁজে পাই– ঠিক ততটাই আমি এক সময় নিজেরে মনে হয় একেবারে থেমে যাওয়া পড়ে ঠাণ্ডা পাথর হয়ে গেছি।

আসলে আমি কেন যে এমন গতি পাই আর কেনই বা এমন পাথরের মতো হয়ে যাই– সেটা আমি ভালো করেই জানি–আর জানি বলেই আমার এমন অসহায় লাগে। না জানলে অন্তত এমন অসহায় নিজেকে কখনো মনে হত না। আমি অনেক কিছু জানি তা তো নয়; কিন্তু কেন আমার এমন প্রতিক্রিয়া হয়, আমি আমার প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসগুলি জানি– আগে তাও জানতাম না। আমি জানি আমার কোন আবেগ তুলে নিলে আমার আসলে কী অবস্থা হবে। আর কোন আবেগটা থাকলে কী আর না থাকলেই বা কী হবে। আমি অন্তত এটা শিখতে পেরছি। কিন্তু এই এইটুকু জেনে যাওয়াই আমার কাছে ভয়ংকর বলে মনে হয়। আমি শরীর ভোগ তো কম করি নি কিন্তু এর মানে কী? শরীর ভোগকে এমন নীচ হীন মনে হয়। মনে হয় এটা স্রেফ একটা কুকুর বেড়ালের কাজ। এটা নিয়ে অত আয়োজন কেন। কেন এমন মোহাবেশ তৈরি করে রাখা? আরেকজনকে আকর্ষণ করার জন্য কত কী কত বাহানা। তার কোনো শেষ নেই। কত রকম রঙ বাহার কত রকম পোষাক কত গান কত সিনেমা কত কি, সব কিছুর যেন একটাই উদ্দেশ্য মানুষের ভেতরে একটা অতৃপ্ত মানুষকে খুঁচিয়ে বের করা। এজন্য এগুলিকে এত সেয়ানা মনে হয়। এসবের একটা শয়তানী শক্তি আছে। আমার এক বন্ধু তো বলেই ছিল, 'শিল্পের একটা ডায়াবলিক শক্তি আছে। শয়তানী শক্তি আছে। পৈশাচিক প্রেতশক্তির মতো অন্ধাকর ভয়াল রহস্যময় শক্তি তাকে কোনোভাবেই ঠেকানো যায় না।'

আমিও বা কেউ সেই শক্তির কবল থেকে নিজেকে বের করতে পারিনি। আমি অল্প বয়সে অনেক কঠিন কঠিন বই পড়েছি তা আমার ভেতরে অনেক ভালো কিছু তৈরি করার পাশাপাশি আমার ভেতরের অন্ধকারগুলির সঙ্গেও আমার দেখা করিয়ে দিয়েছে। সেই চিনে নেওয়ার কারণে তৈরি হয়েছিল নিষিদ্ধ একটা টান। আমি জানি এই টানটাই আমার সবকিছু ভালো-মন্দের মূল কারণ, আমি যেমন এতে সাড়া দিতে পারতাম, তেমনি এটা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পারতাম। আমি বোধ হয় আমার ভেতরের যে অংশটা মানুষ আর যে অংশটা মানুষ-নয় অন্য কিছু, ঠিক পশু তো মানুষ হতে পারে না। হলে পশুর চেয়েও ভয়ংকর কিছু একটা। কারণ পশু যা কিছু করে প্রবৃত্তির বশে করে; কিন্তু মানুষ তার মন্দকাজগুলিও বুদ্ধি দিয়ে করতে পারে। মানুষ বুদ্ধি না চলে যদি প্রবৃত্তি দিয়ে চলত তাহলে মানুষ যতটা খারাপ হতে পারে ততটা খারাপ হতে পারত না। রুশো যে বলেন, শিক্ষা হল সবকিছুর নষ্টগোড়া এটা একেবারেই ঠিক বলেন। মানুষকে অশিক্ষা প্রবৃত্তি দিয়ে চালাতে পারত কিন্তু শিক্ষা এক ধরনের শয়তানীও শেখায়। আবার শিক্ষা না হলে এই পৃথিবীতে কত কত ভালো মহৎ জিনিসও তো ঘটত না।

আমি অন্যদের কথা জানি না, আমি তো যত জেনেছি, ততই জেনেছি, কত কম জানি, বা অবাক হয়ে চমকে উঠেছি, এই সাধারণ জিনিসটা আমি জানিই না। শিখেছি তো আরো কম। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার মধ্যে যা কিছু তৈরি হয়েছে তার মূলে যত না প্রবৃত্তি তার চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি দায়ী। আমি একটা গোপন স্রোতের ভেতর নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছি। আবার নিজের ভেতরে সেই স্রোতকে বইয়ে দিয়েছি। আমি এক সময় এই স্রোতটিকে বুঝতে পারিনি। কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম তখন আমার আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল। আমি জানি এখন আমি কেমন করে আমার ভুলগুলিকেও উপভোগ করি। এভাবেই আমি আমার সব কিছুকে উপভোগ করতে শিখেছিলাম। ভোগ-দুভোর্গ ও উপভোগ আমি একবারে ভাগ ভাগ করে নিজের মতো করে চিনে নিয়েছিলাম। আমি এই সব করেছিলাম নিজেকে প্রবোধ দিতে। আমি জীবনের সার বলতে যা শিখেছিলাম তা হল এই 'প্রবোধ দেওয়া'। আমি যেকোনো বিপর্যয় তা যত বেশি হোক বা কম আমি নিজেকে বোঝাতে পারতাম। কারণ আমি জানি এই বিপর্যয় কেবল আমার জীবনে প্রথম নয়, এটা অতীতে বহু লোকের জীবনে ঘটেছে, আমার জীবনে যখন ঘটেছে যখন তখন অন্য খানেও তা ঘটছে। এবং আগামীতেও ঘটবে।

২৭.

'তুমি দেশে ফিরবে না।'
'জানি না।'
আমি চায়ের কাপে ঠোঁটে ছোঁয়ালেও চুমক না দিয়ে আরিয়ানাকে দেখতে থাকি। আরিয়ানার চোখ মেঝের দিকে কী যেন খুঁজে অনেক ৰণ ধরেই ও কথাটা চালিয়ে নিতে চাইছে। কিছু না পেয়ে মাঝখানে একবার বলল, 'কিমিকে তোমার মনে আছে?'
'কোন কিমি? তোমার বান্ধবী?'
'আরে তোমাকে চিঠি দিয়েছিল, মনে নেই না।'
'হ্যা তো হঠাৎ কী মনে করে।' আমি একটু থেমে জিজ্ঞাসা করি, 'কী এখনো চিঠি দিতে চায় নাকি?' বলে হেসে ফেলি। কিন্তু আরিয়ানা এমন একটা কথা বলে যে আমাকে হাসিটা মাঝ পথে গিলে ফেলতে হয়।
'কিমির বিয়ে হয়েছিল। বিরাট বড় এক লোকের সঙ্গে। কিন্তু লোকটা ছিল হিজড়া।'
'তারপর!"
'তারপর তো বোঝ, কিমির মতো ক্রেইজি মেয়ে। সেদিন ভোরে বাড়িতে ফিরে আসে। আর তখন শোনে তার বর আত্মহত্যা করেছে।'
'কী বলছ।' আমি ক্যাফের ভেতরে একটু চেঁচিয়ে উঠি।
'কিন্তু কিমি তাকে দেওয়া সমস্ত গহনাগাটি নিয়ে এসেছে। একটা কানা সোনাও ফেলে আসেনি। ওর মতো এমন নির্মম মেয়ে আমি আর দেখিনি। অথচ আগে মনে করতাম শরীর ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না।'
'হ্যা তা বোঝে না বলেই তো রাগেদুঃখে কাজটা করেছে।'
'কিন্তু লোকটা যে মরে গেলো তার দিকটা একবার ভেবে দেখো। তা নিয়েও তার কোনো দুঃখ ছিল না। আমি কেবল মনে করতে পারি বিয়ের দিন লোকটা এত কাঁদছিল। সে কি বলব। লোকটা দেখতেটেখতে রীতিমতো ভালো ছিল। যেমন ম্যানলি, তেমনি তার স্বাস্থ্য। আমি তো দেখেই বলেছিলাম, কিমি এতদিনে তোর নাম সার্থক হবে।'
'সেটা কী রকম । ওর নামটা সেক্সি না, ওর সব মিটিয়ে দেবে ওর ওমন স্বাস্থ্যবান বর।'
আরিয়ানার কথায় হাসি পেলেও আমি হাসি না। কারণ আমার বুদ্ধি আমাকে বলে দেয় এটা হাসার মতো সময় নয়। আমার বুদ্ধি আমাকে এভাবে কেবল কথা বলে ওঠে। আমাকে বলে দেয়, ওটা করো না, এটা করো। আর বুদ্ধিই গণ্ডগোল গুলো বাঁধায়। আমি তখন কোনো পথ খুঁজে পাই না। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, ঠিক তখন আমার বুদ্ধি কোথা থেকে চিরিক দিয়ে ওঠে। আমার ভেতরে আমি কতটুকু জানি না কিন্তু বুদ্ধি আমাকে প্রায় সময় বলে দেয়, এটা করো এটা করো না, বা এটা তোমাকে করতেই হবে। অথচ আমি আবার আরেক বুদ্ধির আরেকদিক থেকে শুনি কোনাভাবেই এটা করা যাবে না। এই বুদ্ধিরা আমার কাছে আসতে শুরু করল যখন আমি বুয়েট থেকে পাস করে একেবারে নিরাবলম্বী হয়ে গিয়েছিলাম।
মানুষের তখনই সবচেয়ে সেরা কৌশল কাজে লাগায় যখন সে একেবারে অবলম্বনহীন হয়ে যায়। কথায় বলে না, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেই সে এগুনো শুরু করে। আমি মনে করি তার চেয়ে নিরুপায় হয়ে গেলে বা বে-কারার হয়ে গেলেই মানুষের যেটা হওয়ার কথা বা যেটা হওয়ার কথা নয় তা শুরু হয়। আমি এই জীবন বে-কারার হয়েছিলাম সেই একবারই, আমার যে কোনো মূল্যে লন্ডনের মাটিতে পা রাখতে হবে।
সেই পুরোনো উপকথাটা মনে পড়ে গেল। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য মৃত্যু। সবচেয়ে বড় মিথ্যা দুনিয়া। পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নিজের লক্ষ্য যার জন্য যা যা করতে হবে তা করা। আর মিথ্যা কথা বলতে হয়, কারণ সত্য কথা তাকেই বলা যায় যার সত্য কথা সইবার ক্ষমতা আছে। আমাদের

দেশে লোকে সত্য কথা বলতে ভয় পায় না বলে না– কারণ এখানে কারো সত্য সহ্য করার মতো সামর্থ্য নেই। তাই সত্যটা সবাই জানলেও কেউ বলে না। কিন্তু আমরা তো সবাই যার যার জায়গায় সত্যটা বলতে পারি। অত্যাচারীর মুখের ওপর সত্য কথাটা বলাই সবচেয়ে বড় বীরত্ব। মুখের কথা দিয়েই পালটে দেওয়া যায় সব কিছু। মহৎ বক্তৃতা যে দিয়ে পৃথিবীতে বড় বড় পরিবর্তনগুলি এসেছে। সেই আলেকজান্ডারের যুদ্ধ ঘোষণা কি আব্রাহাম লিংকন কি লেনিন কি হিটলার। আমর অনেক দিন ধরেই মনে হয়েছে আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস যেমন ডারউইন, মার্কস, ফ্রয়েড ও ডারউইন বাদ দিয়ে হয় না, তেমনি বাদ দেওয়া যায় না হিটলারকে। ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদকে সবচেয়ে ভালো মতো চিনে নিতে হলে হিটলারের সময়কালের পৃথিবী ও তার কর্মকাণ্ডগুলি ভালো মতো বুঝে নেওয়া দরকার। আসলে সূত্রগুলি কোনদিক থেকে মেলানো যায়, যে নিজের জন্য ভালো সে অন্যর জন্য ক্ষতিকর, আবার যে অন্য সবার জন্য করে, সে নিজের জন্য কিছুই করতে পারে না। হিটলার জার্মানির জন্য অমঙ্গলময় কিছু ভাবতে পারে না। কিন্তু তার এই মঙ্গলচিন্তা অন্যদের জন্য বিপজ্জনক। নিজে নিজেকে খেয়ে কি বেড়ে ওঠা যায়? অন্যকে গ্রাস না করলে কী করে বড় হয় আরেক জন? আসলে সব সূত্রগুলি বেশ গোল বাঁধিয়ে দেয় শেষ পর্যন্ত।

২৮.

কখন একটা মানুষ বুঝতে পারে বা সে বলতে পারে বা বলে, আমি আলোপ্তগিন নামে একটা মানুষ আছি? এই পৃথিবীর সবার ভেতরে সবচেয়ে আলাদা। আবার এই মানুষটাই আবার বুঝতে পারে সে কিছুতেই সে নয়, অন্যদের মতোই পরিস্থিতির ক্রীড়ানক হয়ে উঠছে। তাকে সবাই তাদের নিজেদের মতো করে বানাতে চাইছে। তাকে কিছুতেই 'সে' হয়ে উঠতে দিচ্ছে না। সেখানেই সে টিকে থাকার পথ পেলেও প্রকৃত বাঁচার পথ পায় না। আসলে সত্যিকারের বেঁচে থাকাটা কী রকম আর কীভাবে সেই বাঁচাটা বাঁচতে হয়–তা বুঝতে বুঝতেই বেঁচে থাকার অনেকটা সময় পার হয়ে যায়। নিজের মনের মানুষ সত্যিকারের মনের মানুষ খুঁজে না পাওয়ার ভেতর থেকেই মানুষের ভেতরে সেই গভীর সংকটটা তৈরি হয়– যা তাকে তার আর সমস্ত কাজের কি অকাজের দিকে নিয়ে যায়। কোনোদিন কেউ কারো মতে হয় না, ফলে আমি যেভাবে চাই ঠিক সেভাবে কেন কেউ 'তার তাকে' আমাকে দেয় না – এই বলে যদি কেউ দুঃখ করে তারও কি ভাবার দরকার নেই যে, নিজে তাকে পুরোপুরি কাউকে দিতে পেরেছে কিনা?

অনেক আগে আমার এক বন্ধুর গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে সন্ধ্যাবেলা পুকুর ঘাটে একদল পোলাপানের ভিতরে আমিও ছিলাম। তাদের একজন ঈদের অনেকদিন পর গ্রামের বাড়িতে এসেছে। অস্ট্রেলিয়াতে নারীপুরুষের জীবনযাপনের বিভিন্ন কথা বলছে। একটা মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথা চলছে, কিন্তু সে ঠিক রাজি নয়, মেয়েটা এলাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী লোকের, সবাই রাজি– মেয়ে দেখতে টেখতেও ভালো, কিন্তু সে বলে, কীভাবে সম্ভব একটা মেয়ের সঙ্গে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া? কথাটায় যুক্তি অযুক্তির কোনোটাই আমি খুঁজে পেলাম না। আমার কেবল সঙ্গে সঙ্গে মনে হল– আর একটা মেয়েরও বা কীভাবে সম্ভব সারা জীবন একটা পুরুষের সঙ্গে কাটিয়ে দেওয়া?

যেকোনো জিনিস উলটা দিক থেকে বুঝে নিতে পারলে বেশ ভালোই বুঝে নেওয়া যায়। কাকে বলে সম্পর্ক? এর চেয়ে কী সম্পর্ক নয়– তা খুঁজে দেখলে সম্পর্কের চেহারাটা বের করা যেতে পারে। কাকে বলে প্রেম; কিন্তু কী প্রেম নয়– তার মাধ্যমে কী তা বোঝা যায়? তাহলে সবকিছুর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম খাটে না। কিন্তু একটা নিয়ম দিয়ে অনেক কিছু ব্যাখা করা গেলেও সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায় না। এই যে যায় না– এর ভেতরেই আমাদের বেঁচে থাকাটা মধুবিষে মিশে বাঁচা হয়ে ওঠে। আমরা প্রায় সময়ই এই বাঁচাটাকে ভুল বুঝি। নিজের দিকটা অন্যের দিক থেকে মানে উলটা দিক থেকে বুঝে নিতে পারলেই নিজের যেমন স্বস্তি হয় তেমনি অন্যেকেও স্বস্তি দেওয়া হয়। এই যেমন আমি আলোপ্তগিন। সত্য আমার

পরিচয়ের প্রথমেই আমার নাম, কিন্তু আমার নামটা আমি কারো মুখে শুনি কি নিজে যখন কোথাও নামটা লিখি মনে হয় এর তলে ছায়ার মতো অন্ধকারকে দেখতে পাই। কারণ আমাকে আদর করে মা আলো ডাকে পুরো নামটা আমি স্কুলের নাম ডাকার সময় ছাড়া বা কোনো কাজের জায়গায় শোনা ছাড়া যেমন ডাক্তারের কাছে লাইন দিলে আমার পালা এলে ডাকা হচ্ছে আলোপ্তগিন। কিন্তু তাছাড়া আমার নাম সবখানে আলো। আর আলো নামটা শুনলেই আমার কানে অন্ধকার শব্দটা ভেসে আসে, শুধু ভেসেই আসে না প্রতিধ্বনির মতো বাজতে থাকে। আর সে কেবল যে সে প্রতিধ্বনি না, কোনো বিশাল পাথুরে পাহাড়ের সামনে, চরাচরে অর কেউ নেই, কোনো একজন আমার নাম ধরে সেখানে দুহাতের অঞ্জলি মুখের কাছে এনে চিৎকার করছে আলোপ্তগিন আলোপ্তগিন আমার নামটা তাতে ভেঙে যাচ্ছে আলো আলো আলো ওপ্ত ওপ্ত ওপ্ত ওপ্ত গিন গিন গিন গিন এভাবে ভেঙে যাচ্ছে নাম আর আমি শুনতে পাই অন্ধ অন্ধ কার কার কার কার।

আমি দুহাতে কান চেপে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে– আমার আমার ভেতর কোনো আলো নেই, আমার ভেতরে শুধু অন্ধকার। লোক হিসেবে আমার কাছে আমাকে এতটুকু ভালো বলে মনে হয় না। আবার যে আমি খুব বাজে লোক তাও নয়, যেমন আমি পারতপক্ষে কারো কোনো ক্ষতি করিনি। কিন্তু আসলেই কী করিনি? যেটুকু সময় আমি এই পৃথিবীতে আছি আমাকে যেমন ঠিকমতো কেউ বুঝতে পারে নি তেমন ভুলও কি অনেকে বোঝে নি? আমি কি সবাইকে ঠিক মতো বুঝতে পারি? বা আমিও কি বহু লোককে ভুল বুঝি নি? আমার প্রথম ভুলটা কোথায় আমি ঠিক ধরতে পারি; কিন্তু নিজের জন্মকে কীভাবে ভুলব?

বীণা আন্টি আমাকে কেন সেই গল্প বলেছিলেন যে কথাটা আমি কাউকে বলতে পারিনি। এমনকি অনেকটা দিন পর্যন্ত বুঝতেই পারি নি যে এতে লজ্জার কোনো কিছু আছে। পরে তো আম্মা আমাকে নিজেই সব বলেছেন। গুলশান খানের ওপর কোনো রাগ জিদ কোনোটাই হয়নি। হলেও বা আমি কী করতে পারি? আমার জন্ম কি ভুল? তারপরও আমি কেন দুর্বলবোধ করেছিলাম। আমি কেন কেঁদে ফেলেছিলাম আর সেই দুর্বল সময়টাকে নিজের মতো করে আমাকে ব্যবহার করেছে বীণা আন্টি। আমি তো তা-ই দিখি। অনেক পরে মনে হয়েছে বীণা আন্টি যাকে মনে করতাম আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসে সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারে, তার চেয়ে মহান কেউ নেই, উদার কেউ নেই সে আমাকে স্রেফ ব্যবহার করেছে। আমি তার কাছে একটা বিকল্প ছাড়া আর কিছু ছিলাম না। কিন্তু তাকেই বা কীভাবে দোষ দেই তিনি তো কোনো দিন বলেননি আমাকে তিনি ভালোবাসেন আমার জন্য তিনি তিনি সব কিছু বাদ দিতে পারেন। বরং আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, যে আমি যা চাই তা হয় না অন্তত এদেশে হয় না।

'তাহলে আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাই?'

'পাগল তা কী করে হয়?'

'আমি তো এখন তা পারি না।'

আমি বলেছি, আমি তার জন্য সব করব তার জন্য যে কাজ করা লাগবে করব।

বীণা আন্টি কেবল বলেছেন, 'পাগল তা কি কখনো হয়?'

তারপর আমি রাগ করে চলে এসেছি।

২৯.

নিজেকে নিজের হাতে ছিড়তে ইচ্ছা করেছিল, আসলে কী যে করতে ইচ্ছা করেছিল, আমি বলতে পারব না। সেদিন কেবল কয়েক প্যাকেট সিগেটের শেষ করেছিলাম। টাকা থাকলে বোতল নিয়ে বসে রাতটা কাটানো যেত। হায়! একা একা মদ খেতেও তো ভালো লাগে না।

একা একা করতে ভালো লাগে এমন একটা কাজ আমার নেই। আমি তখন মনে করতাম, সত্যি যদি একা একা করতে ভালো লাগে এমন একটা কাজ আমি কি পারি না? আমি একবার ভাবলাম ফটো তুললে কেমন হয়? কিন্তু ইচ্ছা করল না। আমি তো লেখালেখি করতে পারব না, ছবি আঁকতেও পারব না। তখন খুব মনে হয়েছিল লেখালেখি আর আঁকাআকি যারা করে তাই হল সবচেয়ে ভালো থাকতে পারে– এই সীমাহীন কষ্টের পৃথিবীতে– কারণ তারা তাদের সাফারিংসকে, ক্রাইসিসকে ডাইভার্ট করে দিতে পারে। 'রঙ যেন মোর মর্মে লাগে/ আমার সকল কর্মে লাগে'– কত আগে শোনা সেই গানটা আমার কানে বেজে উঠেছিল। কিন্তু যে রঙ লাগাতে হবে সেই রঙই তো আমি আর দেখতে পারি না। আমার কাছে চারপাশের সবকিছু বিবর্ণ থেকে বিবর্ণতর হয়ে উঠছে।

আমি আর কোনো কিছুতে নিজের ভেতরে থেকে কোনো মজা পাই না। কোনো থিমপার্কে গেলাম সেখানে কৃত্রিম জগতে কৃত্রিম আনন্দ হৈচৈ করলাম– কিন্তু তার কোনো কিছু মনের ভেতরে বহন করে নিয়ে আসতে পারি না, বহন করে নিয়ে এলেও ঠিক ধারণ করতে পারি না। যে আমি কিছু ধারণ করতে পারি না, সে আমি তাহলে ফাঁকা শূন্য একটা লোক ছাড়া আর কি? আমার মনের জগতে ফাঁকা শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই এই শূন্যতা কখনো টোরা, কখনো ডোরাকে দিয়ে পূর্ণ করা সম্ভব নয়। আসলে আমি জানি না কীভাবেই বা এটা পূর্ণ করা সম্ভব। প্রতিদিন নতুন করে নিজেরকে জন্ম না দিলে সব অর্থহীন হয়ে যায়।

আমি এক রকম জেদের বসেই দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম। আমি জানি জেদের বসে অনেকে অনেক কিছু করে, কিন্তু দেশ ছেড়ে চলে আসাটা একেবারেই ঠিক হয় নি। কিন্তু আমার আর কী বা করার ছিল। কারণ দেশে থাকলে একটা জিনিস থেকে আমি কিছুতেই নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারছিলাম না। সেটা হল বীণা আন্টি ও তার শরীর। আর কোনো শরীরের প্রতি আমি নিজের কোনো স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। আমি সম্পূর্ণতই একগামী একটা লোাক। এক সঙ্গে বহুজনের কাছে যাওয়া আমি কল্পনাও করি না। সবচেয়ে বড় কথা এটা আমি কাউকে বলতে পারি নি। বলতে পারলে হয়তো অনেকটা হালকা হতে পারতাম। মাঝে মাঝে ভেবেছি বলেই দেই– কী আসে যায়, আমি তো শান্তি পাব। কিন্তু বলে দিলে মনে হয় আমিই আমার কাছে হেরে যাব। নিজের কাছে নিজের হারের চেয়ে বড় হার আর হয় না। আমি আরো একটা জিনিস খেয়াল করতাম– আমার আসলে কোনো বন্ধু নেই। আসলে বীণার মতো একজন মানুষ থাকলে বন্ধুর দরকার হয় না– যে মন ও শরীর সবদিকে আমাকে ভরিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমি না ভেবে পারি না আমাকে তিনি কেবল তার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। আমার কাছে আমি তার সময় কাটানোর একটা বস্তু ছাড়া আর কিছু ছিলাম না। কিন্তু আমার ভুবন তো তাকে বাদ দিয়ে আর হয় না। বিগত পনেরো বছরের একেবারে শুরু থেকে আমি তাকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না। আর চেনার দারকারও মনে করিনি। আমার জগত জুড়ে ভুবন জুড়ে কেবল একজন তার নাম বীণা। তার সুর আমার অস্তিত্বের সুর। আমি এও জানি এতে ভালোবাসা যতটা ছিল তার চেয়ে বেশে শরীর ছিল, শরীর দিয়ে তিনি আমার মনকে নয় আত্মাকে তার মুঠোর ভেতরে নিয়ে ফেলেছেন। রূপকথায় পড়া দৈত্যদের প্রাণ ভোমরা যেন গভীর কূপের কোনো কূয়ার ভেতরে রাখা কৌটার ভেতরে বন্দি হয়ে থাকে আমার প্রাণ ভোমরা বীণা আন্টির গভীর কূপের সেখানের এক কৌটার ভেতরে বন্দি। আমি জানি আমার প্রাণভোমরা কোনখানে বন্দি কিন্তু তা বীণা আন্টি না মুক্ত করলে আমি কীভাবে তা মুক্ত করব। আমার আসলে মুক্তি নেই। দিনের পর দিন আমি এসব ভেবে নিয়ে বাসা থেকে বের হতে পারি না।

৩০.

একমাসের ছুটি নিয়েছিলাম। আমি রাজমহল হাউজিং স্টেটের সমস্ত কিছু তৈরি করে দিয়েছিলাম তাই কোম্পানি আমার ওপর বেশ খুশি ।এখন শুধু কন্ট্রাকটার দিয়ে কাজ গোছানোর কথা। এসব নিয়ে অনেক

কাণ্ড হচ্ছে, অনেক রকম গোপন ব্যাপার স্যাপার আছে। কিন্তু আমি সে সব জেনে কী করব। আমার কাছ আমি করে দিয়েছি তাই আমার কাছে যথেষ্ট। আমি কাজ করব, বিনিময়ে আমার পারিশ্রমিক পাবো। কিন্তু এও আমার কাছে মনে হয় বেশ্যাগিরির মতো। যারাই এ ধরনের কাজ করে তারা বেশ্যা ছাড়া আর কি। টাকার বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করা। কিন্তু এখানে আমি এর চেয়ে আর বেশি কী করতে পারি। তখন আমার মনে হল, আমার এদেশ ছাড়া উচিত। ওদেশে অন্তত দুর্নীতির এই সব নোংরা জল ঘাটা লাগবে না। জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক ভালো– কত শোনা কথাটা কিন্তু এটা কী সহজে মেনে নিতে পারে কেউ। এজন বস্তিতে বড় হওয়া জারজ যদি বিশ্ববিখ্যাতও হয়, অর্থবিত্তপ্রতিপত্তিতে প্রথমসারির একজন হয়, তারপরও কি সে তার জন্মের ওই ইতিহাস মুছে দিতে পারে? মনে হয় না পারে। ঘুরে ফিরে মনের কোনো না কোনো কোণ থেকে ওৎ পেতে থাকা সেই জন্মপাপ যার জন্য তার এতটুকু দায় নেই সেই তার সবচেয়ে বেশি ভোগ করে।

কিন্তু আমার ব্যাপারটা আমি বীণা আন্টি আর মা ছাড়া কেউ তো নিশ্চিত করে জানে না। বাদবাকি সব ফিসফাস পর্যন্ত। তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা আমার জেনে যাওয়ার ভেতর। আমার জ্ঞানসত্তাই আমার বন্ধু হওয়া বদলে আমার শত্রু হয়ে উঠছে। আমি কিছুতেই এর হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছি না। আমার ভেতর থেকে আমার বের হয়ে আসাটা এই সময় সবচেয়ে বেশি জরুরি। কিন্তু আমি তো পারছি না। দিনরাত কেবল একটা জিনিস নিয়ে পড়ে আছি– আমি আমি এবং আমি। একটা খুব শক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার আছে। নইলে আর নিজের অবস্থান পোক্ত হবে না। কিন্তু কীভাবে সেটা আমি নিতে পারি। আর সেই সিদ্ধান্তের ওপরই সব নির্ভর করছে। কিন্তু নেওয়া তো হচ্ছে না। সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই কঠিন কিন্তু নিয়ে ফেললে আর কিছু লাগে না।

আমার বরাবরই যেটা হয়েছে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে। কিন্তু আমি দিনের পর দিন পার করে দিয়েছি কীভাবে আমার সমানের দিনগুলিকে আমি সাজিয়ে ফেলব। অনেকে বলে, জীবনের গোড়া থেকে একটা সত্যিকারের প্রেমিকা জুটিয়ে ফেলতে পারলে জীবনে আর এই নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না। জীবনের পথ একটাই– কিন্তু তা চলতে হয়ে অনেকটা কিছুর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে– সাধারণ লোকের জন্য সেটা হল একটা সঙ্গিনী, আর অসাধারণ লোকের জন্য তা হতে পারে একটা বিষয়। আমার বিষয় নেই, আমার কোনো সঙ্গিনীও নেই। বিষয় মানে মনোযোগের বিষয়; আর সঙ্গিনী মানেও ধ্যানযোগের বিষয়।

আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে প্রথম দিকে লেখাপড়া এবং এর মাঝখানে বীণা আন্টির ঢুকে পড়ার মাঝখানে আর কিছু ছিল না। তিনি আমাকে অনেক কিছু বলেছেন– জীবনের অনেক অচেনা রাস্তা পার করিয়ে নিয়ে এসেছেন– কিন্তু আমি যে বারবার একটা কানাগলিতে এসেই আটকা পড়ছি। পথ না পেয়ে যে পথে এসেছিলাম সেই পথে ফির যেতে যেতে চলে যাচ্ছি আরেকটা অচেনা রাস্তায়। আর আমার কিছুতেই সে রাস্তা পাওয়া হচ্ছিল না। আমার ভেতর থেকে অনেক বিশ্বাস আমি ঝেড়ে ফেলতে না চাইলেও তিনি ঠিকই সেগুলি আমার অজান্তে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। যে পৃথিবীতে কোনো ধর্ষণের ঘটনা হয় সেখানে মানুষের আর কোনো ধর্ম থাকে না। থাকতে পারে না। মাঝেমাঝে মনে হয় তিনি কি আমাকে এক রকম গোপনে ধর্ষণ করেছিলেন? তিনি ধর্ষণ করেছিলেন অমিতের স্মৃতিটাকেও?– যদি অমিত বলে কেউ থেকে থাকে। আমি তার কাছে অমিতের কোনো ছবি পর্যন্ত দেখিনি। আর ঘুরে ফিরে নিজের আসক্তির কথার ঢেকে দিতেন আমার মায়ের কথা বলে। বলতেন, 'কোহিনুর খুব সেন্সুয়াল। সুবক্তগিন চাইছিল সে হবে একেবারে গৃহিণী; কিন্তু তার কথা ভালো ঘর করতে হলে টাকার দরকার। ঢাকা শহরে একজন পুরুষের আয় দিয়ে সে টাকা হবে না। সে প্রথমে নায়িকা হবে। টাকা কামাবে তার পর ঘর হবে। এসব বলত। একটা সত্যিকথা হল, এক সুবক্তগিন ছাড়া কোহিনুরের কাছে আর সবাই এসেছে ওর শরীরের টানে। সুবক্তগিন ওর সত্যিকারের প্রেমে পড়েছিল। কোহিনুর তা জানত আর জানত বলেই সুবক্তগিনকে অনেক যন্ত্রণা দিত। একজন নারী একটা পুরুষকে যত রকম যন্ত্রণা দিতে পারে

কোহিনুর সুবক্তগিনকে তা দিয়েছিল। কিন্তু সুবক্তগিনের অসীম ধৈর্যর কাছে সে শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি। সুবক্তগিনে থেকে আমি প্রথম জানি ধৈর্য আর চেষ্টা কাছে পৃথিবীর কোনো কিছু জিততে পারে না। যে কাজটা আর দশটা মানুষের দ্বারা সম্ভব হয়েছে– তা তো সম্ভব–যা কারো দ্বারা কোনো দিন সম্ভব হয়নি তাও সম্ভব। যে কোনো অসম্ভব মানুষের চেষ্টার কাছে হেরে যেতে বাধ্য। কোহিনুরের দুভার্গ্য যে সে সুবক্তগিনের মতো লোক পেয়েও তাকে হারিয়ে ফেলেছে। জানো, তো তোমার বাবা বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে তার কোনো সঠিক খবর কেউ দিতে পারেনি। এমনিতে বলা হয় যে সুবক্তগিন মারা গেছে কিন্তু তাহলে তার কোনো প্রমাণ কেউ দিতে পারে নি। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয় সুবক্তগিন যা করে এসেছে তাই করছে; এখানো সে অনেক দূরে বসে তার ঐশ্বরিক ধৈর্য নিয়ে এখনো দেখে যাচ্ছে কোহিনুরকে।'

আমি বলতাম, 'এ তো অসম্ভব!'

বীণা আন্টি বলতেন, 'কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।'

এখন আমি জানি এসবই আমার মনে একটা রহস্য তৈরি করে, একটা নীরব ঘৃণা তৈরি করে আমার মায়ের প্রতি, তাতে আমি বীণা আন্টিকেই আমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার একমাত্র আশ্রয় বানিয়ে তুলি। আর আমি তা-ই বানিয়ে ছিলাম। কিন্তু আমাকে কী তিনি কেবলই ব্যবহারই করেছেন। শুধুই ব্যবহার? এটাও আবার আমি মানতে পারি না। মানতে পারি না বলেই আমি অবিরাম নিজের সঙ্গে নিজে যুঝে যাচ্ছি। কিন্তু তাতে না নিজেকে কোনো কিছুতে বোঝাতে পারছি– না আমি কোনো কিছুতে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। আমার একটা বন্ধুর কাছে আমি তো যেতে পারি। আমি কাউকে বন্ধু না ভাবলেও আমাকে তো কেউ কেউ নিশ্চয় পছন্দ করে। হিসেব করে নাকি দেখা গেছে প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন দুটো লোক থাকে যারা তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসলেও সেদুটো লোকের অস্তিত্ব পর্যন্ত সে জানে না। তার জীবনটা এই যে দুটো অজানা মানুষ তার ওপর ভিত্তি করে অর্থময় হয়ে ওঠে। কিন্তু তাতে একটা বায়বীয় বোধ তৈরি হতে পারে। নিজেকে প্রবোধ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এর কোনো বাস্তবতা কি চাইলেও খতিয়ে দেখা যেতে পারে? কে জানে? আমি জানি পারে না। আমি এসব বায়বীয় জিনিস দিয়ে নিজে আর বোঝানোর ক্ষমতা রাখি না। হয়তো সেই বোধ আমি হারিয়ে ফেলেছি অনেক আগে।

আমি কার কাছে যাব? আমি অনেক চেষ্টা করে একটা নামও বের করতে পারলাম না। আমি তাহলে এখন কী করব?#